সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

মে ২০১৪

জ্যৈষ্ঠের ঝড়...

১১ মে ২০১৪ বঙ্গভবনে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এডভোকেট মোহাম্মদ আবদুল হামিদের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী পঙ্কজ সরনের সাক্ষাৎকার

২ মে ২০১৪ বাংলাদেশের প্রফেসর এমেরিটাস আনিসুজ্জামানের ভারত সরকারের 'পদ্মভূষণ' খেতাব প্রাপ্তি উপলক্ষে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম ও আনিসুজ্জামানের সঙ্গে ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী পঙ্কজ সরন

৫ মে ২০১৪ নওগাঁ জেলার পোরশাসাপাহারনিয়ামতপুর উপজেলায় ৪০০ গভীর নলকূপ স্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার শ্রী সন্দীপ চক্রবর্তী

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ একচল্লিশ | সংখ্যা ০২ | বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ | মে ২০১৪

পয়লা বৈশাখ নববর্ষ ও রবীন্দ্রনাথ

খেলা ভাঙার খেলা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ: নজরুল ও তাঁর কবিতা ০৪
প্রবন্ধ: জ্যৈষ্ঠের ঝড় ০৯
প্রবন্ধ: কাজী নজরুল ইসলামের গজল ১৩
এক নজরে: কাজী নজরুল ইসলাম জীবনপঞ্জি ২০
প্রবন্ধ: বিদ্রোহী কবি: বিদ্রোহী কবিতা ২২
কবিতা ২৪
ছোটগল্প: পদ্ম-গোখরো ২৬
শিশুতীর্থ ৩২
উপন্যাস: নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময় ৩৫
প্রবন্ধ: পয়লা বৈশাখ নববর্ষ ও রবীন্দ্রনাথ ৪০
ছোটগল্প: খেলা ভাঙার খেলা ৪৪
শেষ পাতা: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮

নজরুল ও তাঁর কবিতা

কে নজরুল? আর কেনই-বা নজরুল? সচেতন কোন বাঙালির পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন বলে মনে হয় না। তবু এই প্রশ্ন উত্থাপনের পিছনে আছে নজরুলকে নতুন করে বোঝার আকাঙ্ক্ষা, আছে নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবনের বাসনা। কে নজরুল? সহজ উত্তর– হাজার বছরের বাঙালির ঋদ্ধ ইতিহাসের ধারায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক বাঙালির নাম কাজী নজরুল ইসলাম। একজন স্রষ্টা এবং কর্মযোগী মানুষের নাম কাজী নজরুল ইসলাম। সাহিত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে একটি জাতিকে জাগিয়ে তোলেন যিনি, তিনিই নজরুল। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে এক প্রবলপ্রাণ বিদ্রোহী নাম কাজী নজরুল ইসলাম।

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স নূরন নাহার

মুদ্রণ গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি.
৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ফোন ৯৫৫৪৮০৪

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩-৭, ৯৮৮৮৭৮৯-৯১ এক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৯৮৮২৫৫৫, e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান-১ ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

সম্পাদকীয়

কোন সুদূরের কাল থেকে ভেসে এল পঁচিশে বৈশাখের ঘণ্টাধ্বনি, আমাদের চৈতন্যলোকে তার প্রতিধ্বনি এসে লাগল, আমরা বিস্ময়ে বিবশ হয়ে পড়লাম। এ কী গো বিস্ময়! এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর, এত সুখ আছে, এত সাধ আছে– প্রাণ হয়ে আছে ভোর। এক লহমায় আমাদের চৈতন্যনির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল। তারপর জ্যৈষ্ঠের ঝড় উঠল এগার তারিখে, ব্যর্থপ্রাণের আবর্জনা ঘুচিয়ে দিয়ে আমাদের চেতনায় বিদ্রোহের বার্তা পৌঁছে দিল। আমরা ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলাম। আমি টর্নেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন! আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর। আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাতৃর! রাতের তারা, দিনের রবির করস্পর্শে যে নতুন দিনের সূচনা, জ্যৈষ্ঠের বিদ্রোহী জাতক সেখানে খরতাপ দুপুর রৌদ্র! তাই আমাদের সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ, চেতনাতে নজরুল।

আজ যে বাংলা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষায় স্বীকৃতি পেয়েছে, যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের মহত্তম সৃজনকর্মটি আমাদের উপহার দিয়েছেন, যে চিরন্তন গীতাঞ্জলির হাত ধরে বিশ্বসভায় আমাদের সগৌরব আসন, সেই বাংলা ভাষাটিকে যিনি পরিবেশনযোগ্য করে তুলেছিলেন যতিচিহ্নের প্রবর্তনে, বাংলার নবজাগরণের সেই আদি ঋত্বিক, ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ রাজা রামমোহন রায়ও এই কালখণ্ডে জন্মেছিলেন হুগলি জেলার এক অখ্যাত গ্রামে। আবার কী আশ্চর্য সমাপতন! রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি কাব্যকুসুমের জন্যে যে নোবেল পুরস্কার পেলেন, তারও ঘোষণা এসেছিল এই সময়কালেই।

বহির্বিশ্বে ভারতবর্ষকে পরিচিত করিয়েছেন যে দু'জন বাঙালি– একজন অবধারিতভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে, আরেকজন সত্যজিৎ রায় তাঁর অবিস্মরণীয় চলচ্চিত্রকর্মের মাধ্যমে। ভারতের চলচ্চিত্র দিগ্‌বলয়কে ঈর্ষণীয় উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন এই কৃতি বাঙালি। বৈশাখকে অলংকৃত করেছেন সত্যজিৎ রায়ও।

চলতি সংখ্যাটি আমরা সাজিয়েছি নজরুল রচনাসম্ভার থেকে। তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল্যায়নধর্মী রচনাটি যেমন পাঠকমন তৃপ্ত করবে, তেমনি তাঁর জীবনালেখ্যধর্মী রচনাটিও অন্যমাত্রা যোগ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

পাঠকের পাতা

আ মরি বাংলা ভাষা...

ভারত বিচিত্রার ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সংখ্যায় 'বাংলা ভাষার বিকাশ ও বিশ্বায়ন' নামে প্রণিধানযোগ্য নিবন্ধটি পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। সুলেখিকা দীপিকা ঘোষ আমাকে সেই ছাত্রজীবনে টেনে নিয়ে গেলেন। ১৯৪৭ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার বাংলা পাঠ্যতালিকায় 'বাংলাভাষা' নামে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ ছিল, যার মূল বক্তব্য ছিল সংস্কৃতবর্জিত সর্বজনগ্রাহ্য একটি বাংলা লিখনরীতি অনুসরণের তাগিদ। আর এই গদ্যরীতির প্রতি সংস্কৃতঘেঁষা পণ্ডিতদের বিরোধিতাকে বঙ্কিমচন্দ্র ফোঁটাকাটা অনুস্বারবাদী দলের মত বলে মন্তব্য করতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি। মনে রাখতে হবে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার রেনেসাঁর যুগে বঙ্কিমচন্দ্র *বঙ্গদর্শন* নামে একটি বাংলা পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকাটির মাধ্যমে তিনি শিক্ষিত বাঙালি নরনারী কে ব্যাপক শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডের আদর্শে সামাজিক দায়িত্ব পালনে ব্রতী হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। *বঙ্গদর্শন* বাঙালির পথচলার পাথেয় বললে ভুল হবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ পুনরায় *বঙ্গদর্শন* চালু করেছিলেন। ২০০৪ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি দেখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে চেয়ারটিতে বসে *বঙ্গদর্শন* ও *বিচিত্রা* সম্পাদনা করতেন সেটি এবং যে পালঙ্কে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সেই পালঙ্কটি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে আরেক বিশ্বজয়ী বাঙালি মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দকে মনে পড়ে, যাঁর প্রতিষ্ঠিত বাংলা মাসিক পত্রিকা *উদ্বোধন* এবছর ১২৫তম বর্ষে পদার্পণ করল। ইনিও সর্বজন বোধগম্য একটি বাংলা গদ্যরীতি প্রবর্তনের কথা বলেছিলেন– বাংলা ভাষাকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে উৎসাহী ছিলেন।

শ্রীযুক্তা ঘোষ বাংলাভাষার উৎপত্তি থেকে একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে পতনঅভ্যুদয়-বন্ধুর পথ অতিক্রম করে জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় বক্তব্য রাখার জন্য হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং ১৯৫২ সালের শহীদদের সার্থক উত্তরসূরী তাঁর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশ্ববাসী বাঙালির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ *গীতাঞ্জলির* জন্য নোবেল সম্মানে ভূষিত হবার পর অতুলপ্রসাদ সেন 'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা' বলে যে গানটি রচনা করেছিলেন সেই গানটিই ছিল আমাদের ছাত্রজীব নে গর্বভরে গাইবার মত সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, নজরুল, জীবনানন্দ প্রমুখ বঙ্গজননীর বন্দনাকারীদের সমস্ত প্রশস্তি ১৯৪৭ সালে দুর্বিসহ মাতালের প্রলাপের মত অর্থহীন মনে হল কিন্তু তারপরেও ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব না দেওয়ায় যে বিদ্রোহের শুরু হয় তা ছিল সত্যিই অকল্পনীয়। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার প্রমুখের আত্মদানে বাঙালিচরিত্র অনন্য হয়ে উঠল। ভাষাশহীদ দের রক্তের ধারা ১৯৭১ সালে এক মহাসাগরে পরিণত হল ৩০ লাখ শহীদের রক্তদানের ফলে। 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল– পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান' এই ঐকতানের মধ্য দিয়ে বাঙালি দ্বিজাতিতত্ত্বকে অস্বীকার করে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' এই রবীন্দ্রসঙ্গীতটিকে জাতীয় সঙ্গীত রূপে বরণ করে নিল।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বানে বাঙালি জাতি মরণপণ সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। বাঙালি তরুণদের দীর্ঘ নয় মাসের অসমসাহসী যুদ্ধে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখেই প্রথম স্মরণ করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে আর গর্বিত কণ্ঠে মাথা উঁচু করে বলেন, 'কবিগুরু আপনি বাঙালির ভরুতাকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি কিন্তু আজ স্বাধীন রক্তস্নাত বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে আপনাকে নতুন করে বাঙালির শৌর্যবী র্যের ইতিহাস লিখতে হবে।' রোগজর্জর বাক্যহারা বিদ্রোহী কবি যেন সবার অলক্ষ্যে বলে উঠলেন 'ভূলোকদ্যুলোক গোলক ভেদিয়া উঠিয়াছি চিরবি স্ময় আমি বিশ্ব বিধাতৃর!'

১৯৯৫ সালে আমার বিশ্বভারতী দেখার সুযোগ হয়। শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে রবীন্দ্রনাথের আশ্রমিক ঐতিহ্যে বিশ্বভারতী পরিচালিত হচ্ছে কিনা, প্রশ্ন করলে শান্তিদা 'না'বোধক জবাব দেন। পণ্ডিত নেহরু বিশ্বভারতী পরিচালনার ব্যাপারে বাঙালিদের মতামত চাইলে তাঁরা বিশ্বভারতীকে সরকারিকরণের পক্ষে মত দেন। সরকারি হলে অধ্যাপকসহ সকল কর্মকর্তার বেতনভাতা নিয়মিত হবে এই অজুহাতে তাঁরা গুরুদেবের ধ্যানের আশ্রমিক ঐতিহ্য বিসর্জন দেন। শান্তিদা দুঃখ করে বলেছিলেন, 'তোমরা বাংলাদেশের লোকরাই রবীন্দ্রনাথকে বাঁচিয়ে রাখবে।' গত ২৬ মার্চ প্যারেড গ্রাউন্ডে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ৩ লক্ষ কণ্ঠে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' জাতীয় সঙ্গীত উচ্চারণের সময় আমার শান্তিদার কথা মনে হয়েছিল।

এবার অতুলপ্রসাদ সেনের 'আ মরি বাংলা ভাষা' গানটির প্রসঙ্গে আসি। গানটিতে

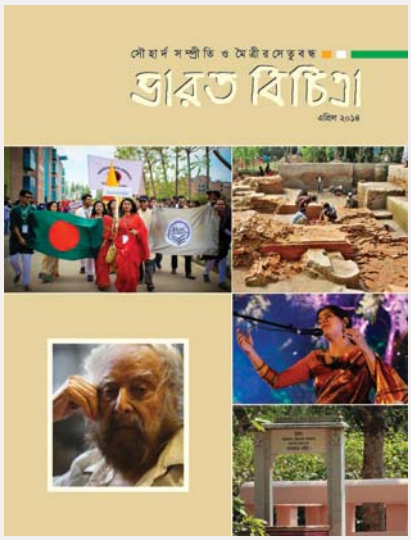

বিদ্যাপতি চণ্ডি গোবিন, হেম মধু বঙ্কিম নবীন, আর রবীন্দ্রনাথের কথাও আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল বাংলাভাষার কবিসাহিতি ্যকদের মধ্যে সগীর, আলাওল, পরাগল খাঁ, আবদুল হাকিম প্রভৃতির নাম নেই কেন? আর বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির পরে রচিত আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি...' এই অমর গানটি কি সর্বজনীন বলে বিবেচিত হবার যোগ্য নয়? এই গানটিতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গান হিসাবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতিধন্য হয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদদের চির-স্মরণীয় করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।' ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরে দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসীদের কাছে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির পরে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে রবীন্দ্রবি দ্বেষীদের তীব্র বাধা অতিক্রম করে স্বাধীন দেশে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে।

পরিশেষে শ্রীযুক্তা ঘোষসহ অন্য বাঙালি গবেষকদের কাছে অনুরোধ রাখব, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমাদের সেনা বিজয় সিংহ হেলায় লংকা করিয়া জয়/ সিংহল নামে রেখে গেছেন নিজ শৌর্য্যের পরিচয়'– এই বিজয় সিংহ কে? শ্রীলংকার গ্রন্থাগারে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত কেউ কি খোঁজ নিতে পারেন না? তদ্রুপ, আরাকান রাজসভার কোন নথিপত্র বর্মার সরকারি মহাফেজখানায় আছে কিনা, সেব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া যেতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে বৌদ্ধযুগের যেসব নিদর্শন আবিষ্কৃত হচ্ছে তাতে এযুগের বাঙালিরা অতীত ঐতিহ্যের সুলুক সন্ধান পাবেন বলে মনে করি।

সমীররঞ্জন শীল
আনন্দ নিকেতন, বাড়ি ৭৯, সড়ক ৪, বক বি, নিকেতন, গুলশান ১, ঢাকা ১২১২

প্রবন্ধ

নজরুল ও তাঁর কবিতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ

কে নজরুল? আর কেনই-বা নজরুল? সচেতন কোন বাঙালির পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন বলে মনে হয় না। তবু এই প্রশ্ন উত্থাপনের পিছনে আছে নজরুলকে নতুন করে বোঝার আকাঙ্ক্ষা, আছে নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবনের বাসনা। কে নজরুল? সহজ উত্তর– হাজার বছরের বাঙালির ঋদ্ধ ইতিহাসের ধারায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক বাঙালির নাম কাজী নজরুল ইসলাম। একজন স্রষ্টা এবং কর্মযোগী মানুষের নাম কাজী নজরুল ইসলাম। সাহিত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে একটি জাতিকে জাগিয়ে তোলেন যিনি, তিনিই নজরুল। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে এক প্রবলপ্রাণ বিদ্রোহী নাম কাজী নজরুল ইসলাম। মানবতার তূর্যবাদক এক সেনানীর নাম নজরুল, অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক সংহত রূপের নাম নজরুল। পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীকে জাগাতে চান যিনি, প্রেমের অধরা মাধুরীর কথা কবিতা ও গানে শোনান যিনি, স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ান যিনি, শাস্ত্রাচার-লোকাচার আর সাম্প্রদায়িক শক্তির বিপক্ষে কলম ধরেন যিনি– তিনিই নজরুল। কতভাবেই তো নজরুলের পরিচয় তুলে ধরা যায়।

কাজী নজরুল ইসলামকে স্রষ্টা এবং কর্মযোগী মানুষ হিসেবে দেখতেই আমি ভালবাসি। জন্মের পর একশো চৌদ্দ বছর অতিক্রান্ত, তাঁর নীরব হওয়ার পর কেটে গেছে সত্তর

বছরেরও বেশি সময়, মৃত্যুর পরও আমরা পেরিয়ে এসেছি তিন যুগ; তবু বাংলাভাষী মানুষের কাছে নজরুল ইসলামের অব্যাহত প্রভাব দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। তাঁর সাহিত্যকর্মের পরিমাণ বিপুল, লিখেছেন তিন হাজারের অধিক গান, সম্পাদনা করেছেন একাধিক পত্রিকা, সরাসরি সংশিষ্ট ছিলেন রাজনীতিতে, সংযোগ ছিল মানবকল্যাণমূলক অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। দ্বিমাত্রিক এই প্রয়াস এবং উদ্যোগের কথা স্মরণে রেখেই আমি দেখতে চাই, ভাবতে ভালবাসি নজরুলকে।

যাকে বলি বহুমাত্রিক সাহিত্যপ্রতিভা, নজরুল তার উজ্জ্বল উদাহরণ। কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, ছড়া, ব্যক্তিগত রচনা, চিঠিপত্র, সঙ্গীত– কোন রূপকল্পে না লিখেছেন নজরুল? রবীন্দ্রনাথের প্রবল পরাক্রমের সময় আবির্ভূত হয়েও বাংলা কবিতায় একটা স্বতন্ত্র পরিচয় নির্মাণে সমর্থ হয়েছেন নজরুল। আমাদের কবিতার ধারায় তিনিই প্রথম শিল্পী, যিনি রাজনীতিকে রূপান্তরিত করেছেন শিল্পে। রবীন্দ্রনাথ এবং তিরিশের কবিদের সমকালে কবিতা লিখেও তিনি মুহূর্তেই চিনিয়েছিলেন তাঁর প্রাতিস্বিক স্বর। নজরুলের দ্রোহচেতনা সঞ্চারিত হল ঘুমন্ত এক জাতির মর্মমূলে। কবিতাও যে হতে পারে জাগরণের শক্তি– উৎস, নজরুলের কবিতা পাঠেই তা প্রথম জানল বাঙালি জাতি। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জয়পতাকা উড়িয়ে বাংলা কবিতায় তিনি আবির্ভূত হলেন বন্ধনমুক্ত প্রমিথিউসের মত। কবিতায় নজরুল উচ্চারণ করেছেন মানবতার জয়, কামনা করেছেন প্রান্তবাসী নিম্নবর্গের উত্থান। তাঁর কবিতায় পরাক্রমশালী বিদ্রোহীর পাশেই আছে কুলিমজুরক ্ষকশ্রমিক আর ধীবরের দল, আছে সাঁওতালগা রোভীল জন গোষ্ঠী। তিরিশের এক কবি জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যেখানে উচ্চারণ করেন 'সহে না সহে না আর জনতার জঘন্য মিতালি', নজরুল সেখানে উচ্চারণ করেন, কবিতায়,– 'চাইনে সুর, চাই মানব'। ফ্যাসিবাদের উগ্রআগ্রাসনের মধ্যে বাস করেও রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন– 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ', তেমনি অভিন্ন চেতনায় নজরুলের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়– 'আমি আজো মানুষের প্রতি আস্থা হারাইনি। মানুষকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। স্রষ্টাকে আমি দেখিনি, কিন্তু মানুষকে আমি দেখেছি। এই ধূলিমাখা, অসহায়, দুঃখী মানুষই একদিন বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করবে।' এই মানবতাবাদী চেতনাই কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার কেন্দ্রীয় সুর। সুস্পষ্ট মানববন্দনা সমকালের সাহিত্যধারায় নজরুলকে স্বকীয় মাত্রায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। কবিতায় নজরুল মানুষকে বিবেচনা করেছেন সাম্যবাদীর দৃষ্টিতে, কোন ভেদচিন্তা সেখানে শিকড়ায়িত হয়নি। স্মরণ করা যায়, তাঁর বহুল উচ্চারিত এই পঙ্‌ক্তিগুচ্ছ:

গাহি সাম্যের গান–
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।
নাই দেশকালপা ত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
('মানুষ' / *সাম্যবাদী*)

অসাম্প্রদায়িক চেতনা কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণ। তাঁর কালের অন্য কবিদের সাম্প্রদায়িক বলছি না, তবু একথা জোরের সঙ্গেই বলব– কাজী নজরুল ইসলামই বাংলা ভাষার প্রথম অসাম্প্রদায়িক কবি। দ্বিমাত্রিক ঐতিহ্যবোধে ঋদ্ধ ছিল নজরুলের সৃষ্টিশীলমানস। জন্মসূত্রে ভারতীয় উত্তরাধিকারকে তিনি গ্রহন করেছেন আপন উত্তরাধিকার হিসেবে; অন্যদিকে, ধর্মবিশ্বাস সূত্রে তিনি অর্জন করেছেন পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য। দ্বিমাত্রিক এই ঐতিহ্য-চেতনা শিল্পী নজরুলের মানসলোকে উপ্ত করেছে অসাম্প্রদায়িকতার বীজ। নজরুলের সৃষ্টিচৈতন্যে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ এই চেতনা সদা সক্রিয় থাকার কারণেই উচ্চারিত হয় এমন প্রত্যয়দীপ্ত চরণগুচ্ছ– 'অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ, / কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ/'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?/কাণ্ডারী! বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র। ('কাণ্ডারী হুশিয়ার'/*সর্বহারা*) নজরুল প্রচলিত ও সনাতন ধর্মচেতনার ঊর্ধ্বে উঠে, কবিতায়, মানবধর্মের জয়গান গেয়েছেন। সনাতন ধর্মাচরণে তাঁর ছিল না কোন বিশ্বাস। তাই স্পষ্ট করেই তিনি ঘোষণা করেন এই কথা:

কাটায়ে উঠেছি ধর্মআফিম- নেশা
ধ্বংস করেছি ধর্মযাজকী পেশা
ভাঙি' মন্দির, ভাঙি' মসজিদ
ভাঙিয়া গির্জা গাহি সঙ্গীত,
এক মানবের একই রক্তনেশা
কে শুনিবে আর ভজনালয়ের হ্রেষা।
('বিশ শতাব্দী'/*প্রলয়-শিখা*)

নজরুল ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি, তিনি বিদ্রোহ করেছেন ধর্মব ্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। একালে যেমন, সেকালেও তেমনি, ধর্মকে শোষণের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই ভণ্ড মোলা–মৌলভী আর পুরোহিতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি ছিলেন সোচ্চার। *রুদ্র-মঙ্গল* গ্রন্থে তিনি লিখেছেন– 'হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিতত্ব। তেমনি দাড়িত্ব ইসলামত্ব নয়, ওটা মোলাত্ব। এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি। আজ যে মারামারিটা বেধেছে, সেটাও এই পণ্ডিত-মোলায় মারামারি, হিন্দুমুসলমা নের মারামারি নয়।... অবতার-পয়গম্বর, কেউ বলেননি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি ক্রীশ্চানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমরা মানুষের জন্য এসেছি,– আলোর মত, সকলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তেরা বললে, কৃষ্ণ হিন্দুর; মুহম্মদের ভক্তেরা বললে, মুহম্মদ মুসলমানদের; খ্রীষ্টের শিষ্যেরা বললে, খ্রীষ্ট ক্রীশ্চানদের। কৃষ্ণমুহ ম্মদ-খ্রীষ্ট হয়ে উঠলেন জাতীয় সম্পত্তি। আর এই সম্পত্তিত্ব নিয়েই যত বিপত্তি। আলো নিয়ে কখনো ঝগড়া করে না মানুষে, কিন্তু গরুছাগল নিয়ে করে।'

বস্তুত মানুষকে, মানুষের ধর্মকে নজরুল বড় করে দেখেছেন আজীবন। তিনি চেয়েছেন মানুষের কল্যাণ, সমাজের মঙ্গল, স্বদেশের স্বাধীনতা। তাই হিন্দু বা মুসলমান নয়, বিদ্রোহের জন্য মানুষের প্রতিই ছিল তাঁর উদাত্ত আহ্বান। তিনি কল্পনা করেছেন এক সাম্যবাদী সমাজের, যেখানে নেই শোষণ, বৈষম্য আর সাম্প্রদায়িক বিভেদ, নেই আদিজন গোষ্ঠীর প্রতি কোন তুচ্ছতাবোধ:

গাহি সাম্যের গান–
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধাব ্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধমুসলিম- ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান।
কে তুমি? পার্সী? জৈন? ইহুদী? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কনফুসিয়াস? চার্বাক-চেনা? বলে' যাও, বল আরো।
... ...
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোন মন্দিরকাবা নাই।
(সাম্যবাদী/*সাম্যবাদী*)

মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা আর বিশ্বাস ছিল বলেই চরম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মুখেও নজরুল অবলীলায় শ্যামাসঙ্গীত আর বৃন্দাবন- গীত রচনা ক রেছেন; লিখেছেন গজল, ব্যাখ্যা করেছেন তৌহিদের একেশ্বরতত্ত্ব। তিনি জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সকল মানুষের কল্যাণ কামনা করেছেন। তাই যখন খণ্ডিতভাবে তাঁকে উপস্থাপন করা হয়, তখন তাঁকে অপমানিতই করা হয়। তাঁকে গ্রহণ করতে হবে সমগ্র দৃষ্টি দিয়ে। মনে রাখতে হবে, তিনি যেমন হামদনা 'ত্গজল লি খেছেন; তেমনি লিখেছেন কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত আর শাক্তপদ। কোন কোন ক্ষেত্রে কালীকীর্ত ন ও না'ত্ রচনায় তিনি প্রায়-সমার্থক চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। যেমন, তাঁর একটি বিখ্যাত কালীকীর্তনে আছে:

আমার কালো মেয়ের পায়ের নীচে
দেখে যা আলোর নাচন
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব
যার হাতে মরণ বাঁচন ॥

কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি হিসেবেই বাঙালির কাছে সমধিক পরিচিত। ঔপনিবেশিক শোষণ, সামন্ত-অত্যাচার এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহী রূপে বাংলা কবিতায় আত্মপ্রকাশ করেছেন নজরুল। রোমান্টিক অনুভবে মানবতার সপক্ষে তিনি উচ্চারণ করেছেন বিদ্রোহের বাণী, সত্য সুন্দর মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন যাবতীয় অপশক্তির বিরুদ্ধে, ধর্মীয় শোষণের বিরুদ্ধে এবং জীর্ণ-পুরাতন মূল্যবোধের বিরন্নদ্ধে।

আমার কালো মেয়ের আঁধার কোলে
শিশু রবি শশী দোলে
মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক
ঐ স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগন॥
(*বনগীতি*)

চাঁদসূ র্যের এই চিত্রকল্প নজরুলের একটি অতি পরিচিত না'তে একই ব্যঞ্জনায় নির্মিত হয়েছে:

তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।
মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে।
যেন ঊষার কোলে রাঙ্গা রবি দোলে ॥
(*জুলফিকার*)

কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি হিসেবেই বাঙালির কাছে সমধিক পরিচিত। ঔপনিবেশিক শোষণ, সামন্তঅত্য াচার এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহী রূপে বাংলা কবিতায় আত্মপ্রকাশ করেছেন নজরুল। রোমান্টিক অনুভবে মানবতার সপক্ষে তিনি উচ্চারণ করেছেন বিদ্রোহের বাণী, সত্য সুন্দর মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন যাবতীয় অপশক্তির বিরুদ্ধে, ধর্মীয় শোষণের বিরুদ্ধে এবং জীর্ণপুরাতন মূল ্যবোধের বিরুদ্ধে। পরাধীনতার গ্লানিতে নজরুল-চিত্ত দীর্ণ হয়েছে এবং এই গ্লানি থেকে মুক্তির অভিলাষে তিনি হয়েছেন বিদ্রোহী। তবে, কেবল দেশের স্বাধীনতা কামনাতেই তাঁর বিদ্রোহীচিত্তের তৃপ্তি ছিল না– তাঁর বিদ্রোহ ছিল একাধারে ভাববাদী ও বস্তুবাদী। তাঁর বিদ্রোহ ছিল পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার, সকল আইনকানু নের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ, ইতিহাসনিন্দিত চেঙ্গিসের মত নিষ্ঠুরের জয়গানে মুখর, ভৃগুর মত ভগবানের বুকে পদাঘাতউদ্ য ত, মানবধর্ম প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সংকল্প, ধ্বংসের আবাহনে উচ্ছ্বসিত, সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় উদ্বেলিত।

নজরুলের সাহিত্য, বিশেষত কবিতা, হয়ে উঠেছে অপশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শাণিত আয়ুধ। নজরুলের সাহিত্যে প্রধানত ত্রিমাত্রিক বিদ্রোহভাব পরিলক্ষিত হয়। এই ভাবত্রয় এরকম: ক. অসত্য অকল্যাণ অমঙ্গল ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, খ. স্বদেশের মুক্তির জন্য ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এবং গ. শৃঙ্খলপরা 'আমিত্ব'কে মুক্তি দেওয়ার জন্য বিদ্রোহ। এই ত্রিমাত্রিক বিদ্রোহকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য নজরুল ভারতীয় পুরাণ এবং পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্যকে স্মরণ করেছেন। এক ঐতিহ্য থেকে আরেক ঐতিহ্যে নজরুলের পদচারণার উদ্দেশ্য ছিল সমাজ বিনির্মাণের জন্য বিদ্রোহের সপক্ষে শক্তির সন্ধান করা। 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতায় তিনি দেবী চণ্ডীর অসুরনাশিনী শক্তি আহ্বান করেছেন সামাজিক অসুরশক্তিকে ধ্বংস করার বাসনায়। ধ্বংসের শেষে কবি কামনা করেছেন সৃষ্টির উলাস:

দেখা মা আবার দনুজদলনী
অশিবনাশিনী চ -র ¡প;
দেখাও মা ঐ কল্যাণকরই
আনিতে পারে কি বিনাশ-স্তূপ।
শ্বেতশতদলবাসিনী নয় আজ
রক্তাম্বরধারিণী মা,
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।
(রক্তাম্বরধারিণী মা/*অগ্নি-বীণা*)

বাংলা সামাজিক স্তরবিন্যাসে কাজী নজরুল ইসলামের অবস্থান ছিল 'তলের তলে' (bottom of the bottom)। নিম্নবর্গের অভিজ্ঞতা অধীত বিদ্যা দিয়ে নয়, বরং বাস্তবতার নিরিখেই তিনি অর্জন করেছিলেন। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, নজরুলের কবিতায় অধস্তন বঞ্চিত দলিত ও প্রান্তবাসী জনগোষ্ঠীর কথাই তীব্রভাবে চিত্রিত হয়েছে। নিম্নবর্গ হিসেবে, প্রান্তজন হিসেবে নজরুল কখনো বিস্মৃত হননি নিজের অবস্থান এবং কখনো পরিত্যাগ করেননি সে জনগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা। তিনি ধীবর, শ্রমিক, কৃষকদের নিয়ে কবিতা লিখেছেন, নিম্নবর্গের মানুষের জীবনসংগ্রাম অবলম্বনে লিখেছেন ছড়া ও গান। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় 'ধীবরদের গান' এবং 'চাষার গান' শীর্ষক কবিতার নিচের উদ্ধৃতিদ্বয়:

ক.
আমরা নিচে পড়ে রইব না আর
শোন রে ও ভাই জেলে,
এবার উঠব রে সব ঠেলে!
ঐ বিশ্বসভায় উঠ লো সবাই রে,
ঐ মুটেমজুর জেলে
এবার উঠব রে সব ঠেলে ॥
('ধীবরদের গান'/*সর্বহারা*)

খ.
আমাদের ঘরের বেটির কেশের মুঠি
ধরে নে যায় সাগরপা রে,
দিয়ে হাত মাথায় শুধু
ঘরে বসে রইব না রে।
যে লাঙলফলা দি য়ে
শস্য ফলাই মরুর বুকে,
আছে লাঙল আজও
রুখবো তাতেই রাজার সেপাই ॥
('চাষার গান'/*প্রলয়-শিখা*)

কাজী নজরুল ইসলাম চেয়েছিলেন আপাত ক্ষমতাহীন অন্ত্যজ অসহায় মানুষ তথা প্রান্তজন উঠে আসুক কেন্দ্রের ভূগোলে– অপাঙক্তেয় শূদ্ররাই শাসন করুক পৃথিবীকে। প্রসঙ্গত নজরুলের 'সৃজনের গান' প্রবন্ধের কথা মনে পড়ছে। ওই প্রবন্ধে নজরুল লিখেছেন: 'ব্রাহ্মণপাদরির রাজত্ব গিয়াছে। গুরুপু রোহিত, খলিফা, পোপ নির্বংশপ্র ায়। শত সম্রাট ও সাম্রাজ্য সব ধসে পড়েছে। রাজা আছেন নামে মাত্র। আমেরিকা, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে এখন বৈশ্যের রাজত্ব। এবার শূদ্রের পালা। এবার সমাজের প্রয়োজনে শূদ্র নয়– শূদ্রের প্রয়োজনে সমাজ চলবে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, ব্রাহ্মণঅব্রাহ্মণ সমস্যা সব লাঙলের ফালের মুখে লোপ পাবে।' (*সৃজনের গান*)

নারীকে প্রাকৃতিক লৈঙ্গিক পরিচয়ে না দেখে নজরুল দেখেছেন সামাজিক লৈঙ্গিক তথা জেন্ডার দৃষ্টিকোণে। ফলে অতি সহজেই তিনি কবিতাগানকথা সাহিত্যে নারীর ব্যক্তিত্বের সন্ধান পেয়েছেন, নারীর চিত্তে দেখেছেন বিপুল শক্তির সমাবেশ। 'নারী' কবিতায় তিনি ঘোষণা করেছেন নারীর বিপুল মহিমা, এঁকেছেন নারীর স্বাধিকারপ্র মত্ত রূপ:

সাম্যের গান গাই–
আমার চক্ষে পুরুষরমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
... ...
ভেঙে যমপুরী নাগিনীর মতো আয় না পাতাল ফুঁড়ি!
আঁধারে তোমায় পথ দেখাবে মা তোমারি ভগ্ন চুড়ি!
পুরুষ যমের ক্ষুধার কুকুর মুক্ত ও পদাঘাতে
লুটায়ে পড়িবে ও চরণত লে দলিত যমের সাথে।
এতদিন শুধু বিলালে অমৃত, আজ প্রয়োজন যবে

হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের ধারায় কাজী নজরুল ইসলাম প্রকৃত প্রস্তাবেই একজন মৌলিক লেখক। নজরুলের নানামাত্রিক ভাবনা বর্তমান সময়েও, তাঁর কালের মতই, সমান প্রাসঙ্গিক। অব্যাহত প্রাসঙ্গিকতাই নজরুল-সাহিত্যের কালোত্তীর্ণতার কেন্দ্রীয় উৎস। আমরা আমাদের প্রয়োজনে নজরুল ইসলাম ও তাঁর ভাবনাকে কীভাবে ব্যবহার করতে পারি– সেটাই হওয়া উচিত একালে নজরুলচর্চার মৌল বিষয়।

যে হাতে পিয়ালে অমৃত, সে হাতে কূট বিষ দিতে হবে।
সেদিন সুদূর নয়–
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়!
('নারী'/*সাম্যবাদী*)

কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞার মূলীভূত প্রেরণাশক্তি রোমান্টিকতা। রোমান্টিকতার আন্তরপ্রেরণায় তিনি কখনও উচ্চারণ করেছেন বিদ্রোহের বাণী, কখনও বা গেয়েছেন প্রেম-সৌন্দর্যের গান। তাঁর কবিপ্রতিভায় বিদ্রোহ ও প্রেম মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে– সৃষ্টি হয়েছে এই অসামান্য চরণ– 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য।' উলেখ করা প্রয়োজন যে, নজরুলর এই বিদ্রোহচেতনা ও প্রেমভাবনার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। রোমান্টিক চেতনারই এপিঠ-ওপিঠ বিদ্রোহ আর প্রেম। বস্তুত, নজরুলের বিদ্রোহচেতনা ও প্রেমভাবনা আন্তরসম্পর্কে একে অপরের পরিপূরক– *অগ্নি-বীণার* উদ্দাম বিদ্রোহই *সিন্ধু-হিন্দোল*, *চক্রবাক* কাব্যে রোমান্টিক অনুভববেদ্যতায় রূপান্তরিত হয়েছে উচ্ছ্বাসময় প্রেমে। রোমান্টিক কবিপ্রতিভার দ্বিবিধ মানসপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়– একদিকে অনুধ্যেয় সৌন্দর্য, প্রেমের জন্য বাসনা এবং ব্যর্থতায় হতাশাপরাজয়য় ন্ত্রণা ও স্বপ্নলোকে পলায়ন; অপরদিকে আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার দুর্জয় সংগ্রাম ও বিদ্রোহ। এই দু'ধারাতেই নজরুলের অনায়াস বিচরণ বাংলা কাব্যধারায় নজরুলের প্রাতিস্বিকতার পরিচয়বাহী।

নজরুল প্রেমের কবি, নজরুল প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির মধ্যে আত্মভাবের বিস্তার এবং একই সঙ্গে প্রকৃতির উপাদানসান্নিধ্যে অন্তর-ভাবনার উন্মোচন নজরম্নলের কবিতার সহজাত লক্ষণ। প্রকৃতির বিচিত্র উপাদানকে কবি কল্পনা করেছেন তাঁর মানসপ্রিয়ার প্রতিরূপ সত্তায়। প্রেম ও প্রকৃতিভাবনায় নজরুল আবেগের প্রান্তর অতিক্রম করে ক্রমে উপনীত হয়েছেন দার্শনিক জগতে– প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা নয় বরং বিরহ আর শূন্যতাকেই গ্রহণ করেছেন শাশ্বত সত্য বলে:

অসীম আকাশ আসে মোর পাশে তারার দীপালি জ্বালি',
বলে, 'পরবাসী! কোথা কাঁদ আসি?' হেথা শুধু চোরাবালি!
তোমার কাঁদনে আমার আঙনে নিভে যায় তারাবাতি,
তুমিও শূন্য আমিও শূন্য এস মোরা হব সাথী।
(*চক্রবাক*)

কাজী নজরুল ইসলাম শিশুকি শোরদের জন্য কবিতা লিখেছেন, লিখেছেন অনেক ছড়া। কিশোরসাহিত ্য রচনা করে নজরুল এদেশের কিশোরদের ঘুম পাড়াতে চাননি, বরং ভাঙতে চেয়েছেন তাদের ঘুম। শিশু কিশোরদের অন্তরেই কবি খুঁজে পেয়েছেন আগামীর বিদ্রোহীকে, ভবিষ্যতের সেনানীকে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় তাঁর বিখ্যাত 'সংকল্প' কবিতা, যেখানে কিশোরের বয়ানে তিনি উচ্চারণ করেছেন এই প্রত্যয়দীপ্র চরণগুচ্ছ:

থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে,–
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
... ...
আমার সীমার বাঁধন টুটে
দশ দিকেতে পড়ব লুটে;
পাতাল ফেড়ে নামব নিচে, উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে;
বিশ্বজগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে॥
('সংকল্প')

বর্তমান সময়ে জ্ঞানচর্চার ধারায় Post-colonial Discourse বা উত্তরঔপনি বেশিক তত্ত্ব অত্যন্ত আলোচিত একটি বিষয়। সাহিত্য শিল্পকলা রাজনীতি ও সংস্কৃতি ব্যাখ্যায় এই তত্ত্ব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্ম উত্তরঔপনি বেশিক তত্ত্বের আলোকে বিবেচনা করলে ভিন্ন এক সত্যের সন্ধান পাব আমরা। ঔপনিবেশিক শাসনামলে এক জটিল সময়সংক্রান্তিতে বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের দীপ্র আবির্ভাব। উপনিবেশিত বাংলার অধিবাসী হয়েও নজরুল ইসলাম স্বকালের অনেক লেখকের মত ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের অন্ধ অনুসারী হন নি, বরং তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন ভিন্ন এক জ্ঞানকা-। এই ভিন্নতার সাধনাই বাংলা সাহিত্যের ধারায় তাঁকে এনে দিয়েছে নতুন এক অর্জন, যাকে নিঃসন্দেহে শনাক্ত করা যায় উত্তর- ঔপনি বেশিক ডিসকোর্সের প্রতিফলন হিসেবে। উত্তর ঔপনিবেশিক চৈতন্য খুঁজতে চায় নিজেকে, খুঁজতে চায় উপনিবেশিতের ঠিকানাকে, সত্তাকে, অস্তিত্বকে। নিজের স্বর সন্ধান তথা আত্ম-আবিষ্কারই এই ডিসকোর্সের প্রধান আহ্বান। নজরুলের রচনায় নিজেকে খোঁজার প্রয়াস আছে, তিনি জাগতে ও জাগাতে চেয়েছেন আপন শক্তিতে, আবিষ্কার করেছেন নিজেকে, 'বিদ্রোহী' কবিতায় ঘোষণা করেছেন– 'আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।' নজরুলের রচনায় যেসব যুগান্তকারী বৈশিষ্ট্য রূপলাভ করেছে, উপনিবেশিত সমাজের একজন লেখকের কাছ থেকে তা সচরাচর পাওয়া যায় না। উত্তর- ঔপনি বেশিক নজরুল বাংলা সাহিত্যে যথার্থই এক বিরল, ব্যতিক্রমী, প্রাতিস্বিক, অদ্বিতীয় এবং অনতিক্রান্ত প্রতিভা।

বিষয়ের পাশাপাশি সাহিত্যের প্রকাশরীতি তথা ভাষা ব্যবহারেও নজরুল নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। বিষয়ের নতুনত্ব ও কাললগ্নতা প্রধান আকর্ষণ হলেও, নজরুলের কবিতায় প্রকাশশৈলী ও নির্মাণকলাগত স্বাতন্ত্র্য সহজেই লক্ষ্যযোগ্য। শব্দব ্যবহারে, উপমার ূপকউৎ প্রেক্ষা-চিত্রকল্প নির্মাণে এবং ছন্দসজ্জায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য বাংলা কবিতার এক বিরল সম্পদ। নজরুলের কবিতার প্রকাশশৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর স্বতন্ত্র কবিভাষা। শব্দব ্যবহারের ক্ষেত্রে নজরুলের স্বাতন্ত্র্য সবিশেষ উলেখযোগ্য। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের পরে শব্দব ্যবহারে ব্যক্তিগত রূপসজ্জার প্রথম প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি নজরুল ইসলামের কবিতায়। বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার প্রেরণায় নয়, বরং আবেগের প্রাবল্যে নির্বাচিত হয়েছে তাঁর শব্দমালা। কোনরূপ বিচারবি বেচনার দাসত্ব স্বীকার না করে স্বাধীন স্ফূর্তিতে তিনি চয়ন করেছেন তাঁর প্রিয় শব্দরাজি। শব্দব ্যবহারের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যস চেতনতা নজরুলের কবিভাষায় নিয়ে এসেছে স্বকীয় মাত্রা। শব্দচেতনায় 'সেক্যুলারাইজেশন' নজরুলের কবিসত্তার বিশিষ্ট লক্ষণ। ভারতীয় পুরাণের নানা শব্দ ও অনুষঙ্গ তাঁর কবিতায় যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি সমগুরুত্বেই ব্যবহৃত হয়েছে পশ্চিম এশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের নানা বিষয়– তৎসম তদ্ভব শব্দের পাশেই শিল্পসার্থ কতায় ব্যবহৃত হয়েছে আরবি ফারসি শব্দ।

হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের ধারায় কাজী নজরুল ইসলাম প্রকৃত প্রস্তাবেই একজন মৌলিক লেখক। নজরুলের নানামাত্রিক ভাবনা বর্তমান সময়েও, তাঁর কালের মতই, সমান প্রাসঙ্গিক। অব্যাহত প্রাসঙ্গিকতাই নজরুলসাহি ত্যের কালোত্তীর্ণতার কেন্দ্রীয় উৎস। আমরা আমাদের প্রয়োজনে নজরুল ইসলাম ও তাঁর ভাবনাকে কীভাবে ব্যবহার করতে পারি– সেটাই হওয়া উচিত একালে নজরুলচর্চার মৌল বিষয়। আমাদের ব্যক্তিক এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই নজরুল হয়ে উঠুক প্রতিদিনের চর্চার বিষয়– এটাই আমাদের আত্যন্তিক আকাঙ্ক্ষা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

POND'S®
age miracle™
Unilever
Look up to
10 years* younger.
With Intelligent Pro-Cell Complex
*With regular use.
FORMULATED BY POND'S INSTITUTE

প্রবন্ধ

জ্যৈষ্ঠের ঝড়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একটা রক্তিমবর্ণ ঝড়ের মত নজরুল সেই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। সেই 'প্রাণ-ঠাসা একমুঠো ঘর'। নজরুলের জন্ম জ্যৈষ্ঠ মাসে। বাংলা সাহিত্যেও তার আবির্ভাব জ্যৈষ্ঠের রুদ্র-রুক্ষ আত্মআকাশে রক্তিমবর্ণ ঝড়ের মত। কাজলবর্ণ ঝড় নয়, রক্তিমবর্ণ ঝড়। সে যে মেঘ নিয়ে এসেছিল তা কালো ঠাণ্ডা মেঘ নয়, লাল তপ্ত মেঘ। সে ঝড়ে শুধু শক্তি আর বেগ নয়, নয় শুধু মুক্তবন্ধ উদার-উদ্দামতা, তাতে ছিল একটা বর্ণাঢ্য সমারোহ, দহনদীপ্তির দুঃসহ সৌন্দর্য। সঙ্গে করে সে বৃষ্টিধারা নিয়ে আসেনি, নিয়ে এসেছে বিচিত্রবর্ণ বিদ্যুৎশিখা। ঝড় যে এত মনোহর হতে পারে, বন্ধনহীনতা যে হতে পারে এত ছন্দোময়, ক্রন্দন যে এত গীতসুধান্বিত, তা নজরুলকে দেখার আগে কে ভাবতে পেরেছিল? নজরুল ভয়ঙ্করের বেশে এক সুন্দরের আবির্ভাব।

ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
বধূরা প্রদীপ তুলে ধর!
ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

প্রবল প্রসন্ন প্রাণের পরিপূর্ণ প্রতীক। নজরুলের দুর্বার প্রাণশক্তি তার সমস্ত সৃষ্টিকে প্রণোদিত করেছে। ভাষায় এনেছে তীক্ষ্ণতা, ছন্দে এনেছে জীবনস্পন্দন, ভাবে এনেছে বল-বীর্য ও তেজের উদ্দীপ্তি। শুধু স্বাধীনতা আন্দোলনেই সে বেগসঞ্চার করেনি, সমস্ত বাংলা সাহিত্যের নির্জীব স্নায়ুশিরায় নতুন রক্তের প্রবাহ সঞ্চার করেছে। যা কিছু জীর্ণ ও জরাগ্রস্ত তাকে সংহার করেছে, যা-কিছু জীবন্মৃত তাকে উজ্জীবিত করেছে।

সুদৃঢ় সুদীপ্ত স্বাস্থ্য? এত উচ্চ উচ্চারণ। অনর্গল কথা, অবাধ-উদ্দাম হাসি, অগাধ-উচ্ছ্বসিত গান। আর প্রাণ? প্রাণের কথা বলো। প্রাণই তো বৃহত্তম বিত্ত। সে বিত্তে নজরুল কুবেরসদৃশ। বহুল-আঢ্য। তার প্রাণে কখনো কোন অবসাদ নেই। সে শুধু উৎসাহের উৎসব দিয়ে ভরা। তার প্রাণে অলি-গলি নেই, শুধু এক ঢালাও রাজপথ। ছোট-বড় নেই, আপন-পর নেই, হিন্দু-মুসলমান নেই। পদযাত্রী মানুষের যে জনপথ তাই মিলনের জনপথ।

প্রবল প্রসন্ন প্রাণের পরিপূর্ণ প্রতীক। নজরুলের দুর্বার প্রাণশক্তি তার সমস্ত সৃষ্টিকে প্রণোদিত করেছে। ভাষায় এনেছে তীক্ষ্ণতা, ছন্দে এনেছে জীবনস্পন্দন, ভাবে এনেছে বলবীর্য ও তেজের উদ্দীপ্তি। শুধু স্বাধীনতা আন্দোলনেই সে বেগসঞ্চার করেনি, সমস্ত বাংলা সাহিত্যের নির্জীব স্নায়ুশিরায় নতুন রক্তের প্রবাহ সঞ্চার করেছে। যা কিছু জীর্ণ ও জরাগ্রস্ত তাকে সংহার করেছে, যাকিছু জীবন্মৃত তাকে উজ্জীবিত করেছে। স্বাধীনতার যুদ্ধে নজরুলের দান প্রত্যক্ষরূপে অগ্রগণ্য। সে শুধু নেপথ্যস ঙ্গীতেই থাকেনি, নেমে এসেছে প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনে। দেশমাতার বন্দনা করেছে বীণার তারে নয়, শৃঙ্খলঝঙ্কারে–

এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল॥
তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধনভয়॥
এই শিকলবাঁধা পা নয় এ শিকলভাঙা কল॥

কলোল্ল অফিসে ঢুকেই অট্টহাস কলশব্দে ফেটে পড়ল নজরুল।

ভাবি এত উলাসউৎকর্ষ আর কার ছিল? এত প্রশস্ত চিন্তা? সুদৃঢ় সুদীপ্ত স্বাস্থ্য? এত উচ্চ উচ্চারণ।

অনর্গল কথা, অবাধউ দ্দাম হাসি, অগাধউ চ্ছ্বসিত গান।

আর প্রাণ? প্রাণের কথা বলো। প্রাণই তো বৃহত্তম বিত্ত। সে বিত্তে নজরুল কুবেরসদৃশ। বহুলআঢ্য। তার প্রাণে কখনো কোন অবসাদ নেই। সে শুধু উৎসাহের উৎসব দিয়ে ভরা।

তার প্রাণে অলিগলি নেই, শুধু এক ঢালাও রাজপথ। ছোট-বড় নেই, আপনপর নেই, হিন্দুমুসলমান নেই। পদযাত্রী মানুষের যে জনপথ তাই মিলনের জনপথ। শুধু আমিও চলি, তুমিও চল না, এস হাত ধরাধরি করে চলি। চলি পা মিলিয়ে।

'কৃষ্ণনগর থেকে আসছি'। নজরুল আনন্দে ফেটে পড়ল।

যা বলবে, যা করবে তাইতে তার আনন্দ। উদাত্ত ছাড়া যেন তার সুর নেই। মুখরিত ছাড়া যেন তার ভাব নেই। আলোকিত ছাড়া নেই আর যেন উপস্থিতি।

'এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর।'

এত কথা গান প্রাণ হাসি, এত সুখ ও সাধ নিয়ে এই চলচঞ্চল বাণীর দুলাল কোন তীর্থে গিয়ে উপনীত হবে, কোন্ নিস্তব্ধ পরিপূর্ণতায়?

'কোত্থেকে এসেছ এ আমাদের কাছে খবর নয়।' বলল দীনেশরঞ্জন, 'তুমি যে আমাদের কাছে এসেছ এটাই মস্ত খবর।'

'তা সেটা কৃষ্ণনগরই হোক বা নবীনগরই হোক'। বলল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ।

কিংবা মুরশিদআবাদই হোক।' বলল কে আরেকজন।

তার জায়গার নামকে উপেক্ষা করা হচ্ছে মনে করে নজরুল লালন ফকিরের গান ধরল:

'কৃষ্ণ বিনে তৃষ্ণা ত্যাগী
তবে সেই বটে গো শুদ্ধ অনুরাগী।
মেঘের জল বই চাতক যেমন
অন্য জল করে না গ্রহণ
তেমনি কৃষ্ণভক্ত জনে
কৃষ্ণের লাগি।
কৃষ্ণপ্রেম যার মনে
তার বিক্রম সেই তো জানে
অধীন লালন বলে, আমার
মুখসর্বস্ব মনবিরাগী॥'

শেষ ছত্র গেয়ে হো-হো করে হেসে উঠল নজরুল। বললে, 'মুখসর্বস্ব মনবিরাগী।'

যেন কথাটার মধ্যে নিজেকে ক্ষণকাল দেখতে পেল। মুখে যতই সে কোলাহল করুক, তার মন বুঝি কোন্ না জানা সুদূরের দেশের অতিথি। কোন উদাসীন মহামৌনের।

নৃপেন বলল, 'এবার তবে একটা নবীর গান ধর। তুমি তো দু'দিককেই মেলাবে।'

'দিক একটাই। আর মানুষও একজন।' নজরুল আবার হেসে উঠল।

'কিন্তু ঐ যা বলেছে লালন', বলল দীনেশদা, 'মুখসর্বস্ব মনবিরাগী।'

নজরুল আরেকটা লালনের গান ধরল:

'মুরশিদ বিনে কি ধন আছে রে
এ জগতে।
আপনি খোদা আপনি নবী
আপনি সেই আদম ছবি
অনন্ত রূপ করে ধারণ
কি বোঝে তার নিরাকরণ
নিরাকার হাকিম নিরঞ্জন
মুরশিদরূপে ভজনপ থে।
কেন লালন ফাঁকে ফেরো
ফকিরি নাম পাড়াও মিথ্যে॥'

গান শেষ করে নজরুল আবার হুলোড় করে উঠল।

বলল, 'এবার তোমাদের একটা নতুন গান শোনাই। স্বরচিত।'

আমরা সবাই একবাক্যে প্রতিধ্বনিত হলাম, 'হ্যাঁ, নতুন গান। ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়।'

'হ্যাঁ, এবার কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।' কোত্থেকে একটা হারমোনিয়াম এসে জুটল, নজরুল ভরাট গলায় দরাজ গান ধরল:

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রিনিশী থে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র॥

সে কী গান! কী সে স্বরতরঙ্গ! যেন বন্ধ পাষাণে ফুল ফোটে,

কে হিন্দু কে মুসলমান এটা পরিচয়পত্র নয়, আমরা সকলে মানুষ, একই দস্যুতার লুণ্ঠন, একই হিংস্রতার শিকার, একই দুর্ভাগ্যের শরিক– এই আমাদের ভাগ্যলিপি। এই ভাগ্যলিপিকে তো খণ্ডন করবই, এর চেয়েও যে বড় এক বিধাতার লিপি আছে তাতে আমরা সকলে স্বাক্ষর দেব মানুষ বলে। একই প্রাণঘরের বাসিন্দা বলে। এর বাইরে আমাদের অন্যতর সংজ্ঞা নেই, সংস্থা নেই– আমাদের এক মাটি এক আকাশ একই নিঃশ্বাসবায়ু।

মরুপথের হারা নদী কলস্বনা জলধারা খুঁজে পায়। দাহজ্বরক্ষয় সে কী উজ্জীবন মন্ত্র। এ সদ্যপ্রাণকর অমোঘমন্ত্র কোত্থেকে নিয়ে এল নজরুল। সমস্ত দাসত্ব ভীরুত্ব উড়িয়ে দিল এক ফুঁয়ে।

দেশের মুক্তির চেয়েও বড় কথা শোনাল, মানুষের মুক্তি। এ মুক্তি সমস্ত বন্ধন থেকে, সমস্ত ক্রন্দন থেকে– আর শাসন-শৃঙ্খলই একমাত্র বন্ধন নয়, সংস্কারশৃঙ্খলও বলবান প্রতিবন্ধ।

আর দারিদ্র্য শুধু বিত্তের দারিদ্র্য নয়, চিত্তেরও দারিদ্র্য। দুই দারিদ্র্যকে উৎখাত করার জন্যই নজরুল।

ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে
পুঞ্জিত অভিমান
ইহাদেরে পথে নিতে হবে
সাথে, দিতে হবে অধিকার॥

কে হিন্দু কে মুসলমান এটা পরিচয়পত্র নয়, আমরা সকলে মানুষ, একই দস্যুতার লুণ্ঠন, একই হিংস্রতার শিকার, একই দুর্ভাগ্যের শরিক– এই আমাদের ভাগ্যলিপি। এই ভাগ্যলিপিকে তো খণ্ডন করবই, এর চেয়েও যে বড় এক বিধাতার লিপি আছে তাতে আমরা সকলে স্বাক্ষর দেব মানুষ বলে। একই প্রাণঘরের বাসিন্দা বলে। এর বাইরে আমাদের অন্যতর সংজ্ঞা নেই, সংস্থা নেই– আমাদের এক মাটি এক আকাশ একই নিঃশ্বাসবায়ু।

উদার উত্তাল ডাক দিল নজরুল:

জাতের চেয়ে মানুষ সত্য
অধিক সত্য প্রাণের টান
প্রাণঘরে সব এক সমান।
বিশ্বপিতার সিংহআসন
প্রাণ-বেদীতেই অধিষ্ঠান।
জাতসমা জের নাই সেথা ঠাঁই।
জগন্নাথের সাম্যলোকে
বিধির বিধান সত্য হোক
বিধির বিধান সত্য হোক॥

উনিশশো উনত্রিশের ডিসেম্বর এলবার্ট হলে নজরুলকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য প্রফুলচন্দ্র রায়। মানপত্র পড়ল ওয়াজেদ আলি। বক্তাদের মধ্যে একজন সুভাষচন্দ্র।

অভিনন্দনের উত্তরে নজরুল বলল: 'আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই আমি নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার ধর্ম। যে কূলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই আমি কবি।

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্তানের পথে, তাঁকে ক্ষুধাশীর্ণ মূর্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারে অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপের রূপে অপরূপ করে দেখার স্তবস্তুতি।

কেউ বলেন, আমার বাণী যবন কেউ বলেন কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দুমুসলমান কে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করানোর চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে হাত মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে, তাহলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে। আমার গাঁটছড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কোন বেগ পেতে হবে না। কেননা একজ নের হাতে লাঠি, আরেকজনের আস্তিনে ছুরি।

সুভাষচন্দ্র কী বললে?

বললে, 'ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে অনেক ঘুরেছি, অনেক শুনেছি জাতীয় গান কিন্তু নজরুলের দুর্গম গিরি কান্তার মরুর মত প্রাণমাতানো গান কোথাও শুনিনি।'

সেই সভাতে নজরুল স্বকণ্ঠে শোনাল সেই গান:

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা
জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা
দিবে কোন বলিদান?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের
করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল,
কাণ্ডারী হুঁশিয়ার॥

এই গান রচনার কিছু আগেই ফাঁসি গেছে গোপীনাথ সাহা। টেগার্টকে মারতে গিয়ে ভুল করে মেরেছে ডে-কে। লাল-বাজারের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করে দেশশত্রু টেগার্টকে ভাল করেই চিনে নিয়েছিল সে, কিন্তু কী নিয়তির পরিহাস, সকালের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছে ডে, চৌরঙ্গিপার্ক স্ট্রিটের মোড়ে একটা দোকানের শোকেস দেখছে, ছয়সাত হাত দূর থেকে তাকে টেগার্ট মনে করে গুলি ছুড়ল গোপীনাথ। যখন ধরা পড়ল বুঝল ভুল লোককে মেরেছে, লোক ভুল হলেও তার ফাঁসিতে ভুল হবে না।

হলে হবে ফাঁসি, গোপীনাথ তোয়াক্কা করে না। সে দেশমুক্তির যজ্ঞে ইন্ধন হতে পেরেছে এতেই আনন্দ। ফল-অফল ভুলঅভুল – সমস্ত অবান্তর। ফাঁসির আগের দিন সে কুর্তায় সাবান দিল, চুল ছাঁটল, খেল পেট ভরে। দেখা গেল পাঁচ পাউন্ড ওজন বেড়েছে। হাসতে হাসতে মঞ্চে গিয়ে উঠল। বলল, মা আমাকে ডাকছে, তার বুকে মাথা রেখে এখন ঘুমুব।

দেখা গেল বীর মরে না, বীর প্রাণ দেয়। তার সেই দেওয়া প্রাণই জীবনের জয়গান।

'নজরুল একটা জীয়ন্ত মানুষ।' বললে আরো সুভাষ, নজরুল যুদ্ধে গিয়েছিল, বন্দুক ঘাড়ে করে মার্চ করেছে সৈন্য হয়ে। আমাদের দেশে এমন অভিজ্ঞতা আর ক'জনের? ক'জন সাহিত্যিক দেশের জন্য জেলে যাওয়ার গৌরব লাভ

এই গান রচনার কিছু আগেই ফাঁসি গেছে গোপীনাথ সাহা। টেগার্টকে মারতে গিয়ে ভুল করে মেরেছে ডে-কে। লাল-বাজারের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করে দেশশত্রু টেগার্টকে ভাল করেই চিনে নিয়েছিল সে, কিন্তু কী নিয়তির পরিহাস, সকালের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছে ডে, চৌরঙ্গি-পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে একটা দোকানের শোকেস দেখছে, ছয়-সাত হাত দূর থেকে তাকে টেগার্ট মনে করে গুলি ছুড়ল গোপীনাথ।

করেছে। তাজা মানুষ, কাঁচা মানুষ নজরুল।
সেই সভাতে বীর সেনানী দলের গানও গেয়েছিল নজরুল:
টলমল টলমল পদভারে
বীরদল চলে সমরে।
খুরধার তরবার কটিতে দোলে
রণনঝনন রণড ঙ্কা বোলে
ঘন তুর্য-রোলে শোকম্ত্যু ভোলে
দেয় আশিস সূর্য সহস্র করে॥
সুভাষ আরো বললে, 'কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন তা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়, বাঙালি জাতির স্বপ্ন।'
কে জানেবা সুভা ষের বিশেষ স্বপ্ন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের স্বপ্ন। কদম কদম বাড়ায়ে যার স্বপ্ন!
নইলে নজরুলই বা কী করে গাইতে পারল:
অগ্রপথিক হে সেনাদল, জোর কদম
চলরে চল্।
শুনিতেছি আমি শোন্ দূরে ঐ তুর্যনাদ
ঘোষিছে নবীন ঊষার উদয় সংবাদ।
ওরে ত্বরা কর! ছুটে চল্ আগে–
আরো আগে
গান গেয়ে চল্ অগ্রবাহিনী
ছুটে চল্ তারো পুরোভাগে
তোর অধিকার কর্ দখল:
অগ্রনায়ক রে পাঁওদল
জোর কদম চল্ রে চল॥
আরো বললে সুভাষ, 'নজরুলের লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মত বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গাইবার ইচ্ছে হত। আমাদের প্রাণ কই? গান কই?
বন্ধু দিলীপকুমারকে লিখছে সুভাষ: 'ভাই, জেলে যখন লোহার দরজা ওয়ার্ডার বন্ধ করে দেয় তখন মন যে কী আকুলিব্যাকুলি করে কী বলব। তখন বারবার মনে পড়ে কাজীর গান: কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙ্গে ফেল, কররে লোপাট, রক্তজমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী– কাজীকে ভাগ্যিস জেলে যেতে হয়েছিল; তাই তো বাংলাদেশ পেয়েছে এই কাব্য, এই প্রাণজাগানিয়া গান –'।
একদিন ইংরেজদের পল্টনে সে হাবিলদার ছিল, পরে হল দেশমুক্তির সংগ্রামী বীর সৈনিক। সেদিন কাঁধে ছিল বন্দুক, পরে আয়ুধ হল লেখনী, বন্দুকের চেয়েও যা দুর্জয়, লক্ষ্যভেদী।
আগে ছিল শীতের বাতাস, এখন এক বর্ণাঢ্য জ্যৈষ্ঠের ঝড়।
জ্যৈষ্ঠ মাসের সমগ্র রূপটিই নজরুলের মধ্যে সংহত। জ্যৈষ্ঠের রূপ শুধু রৌদ্রদীপ্তিতেই নেই, তার আরেক রূপ প্রগাঢ় রসপূর্ণতায়। জ্যৈষ্ঠেই ফল রসেব র্ণে ভরে ওঠে, যা রৌদ্রতাপ রসঋদ্ধ। নজরুল তাই রুদ্র হলেও রসবন্ত। সে একটা দীপ্ত দৃপ্ত আনন্দের অনিরম্নদ্ধ ফোয়ারা। বিরামবিহীন প্রাণকলোলের জয়নাদ!
কিন্তু শত ঝড় উঠলেও আকাশ কিছুতেই মুছে যায় না। আকাশের সেই শান্ত স্থিতি শাশ্বতই থেকে যায়। তেমনি নজরুলের সমস্ত ঝড়ের অন্তরালে একটি গভীর শান্তি আছে, বিষাদ আছে– যার জন্ম প্রেমে। সেইটিই নজরুলের সমস্ত দহনদীপ্তির উৎসমুখ। যে প্রদীপের শিখায় দাবানল জ্বলেছে, সে প্রদীপটি আসলে গৃহকোণের স্নিগ্ধ প্রদীপ, হয়তো বা দেবমঞ্চের বাতি। তার শিখায় বিদ্রোহ কিন্তু তার তেলে প্রেম, করুণা, ভক্তি। বিদ্রোহী নজরুলকে ছাপিয়ে উঠেছে প্রেমিক নজরুল, মানবপ্রেমিক নজরুল, তার এই মানবপ্রেম তাকে নিয়ে গেছে ঈশ্বরপ্রেমে।
সমস্ত সন্ধান নিয়ে গিয়েছে সমর্পণে। সমস্ত ক্রন্দন নিয়ে গিয়েছে অতল-অগাধ অকূল স্তব্ধতায়।

লেখকের জ্যৈষ্ঠের ঝড় পুস্তক থেকে সংকলিত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
ত্রিশের দশকের প্রধান কবি, লেখক, ঔপন্যাসিক

ঘটনাপঞ্জি ❖ মে

রাজা রামমোহন রায়

০১ মে ১৯১৯	❖	সুগায়ক মান্না দের জন্ম
০২ মে ১৯২১	❖	সত্যজিৎ রায়ের জন্ম
০৩ মে ১৯১৩	❖	দাদা সাহেব ফালকের জন্ম
০৪ মে ১৯৩৫	❖	কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর জন্ম
০৬ মে ১৮৬১	❖	পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর জন্ম
০৭ মে ১৮৬১	❖	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম
১০ মে ১৮৮২	❖	গুরুসদয় দত্তর জন্ম
১০ মে ১৯০৫	❖	বাঙালি টেস্ট ক্রিকেটার পঙ্কজ রায়ের জন্ম
১৫ মে ১৮১৭	❖	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম
১৭ মে ১৯১৩	❖	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার লাভ
১৯ মে ১৯০৮	❖	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
২১ মে ১৯৯১	❖	রাজীব গান্ধীর মৃত্যু
২২ মে ১৭৭২	❖	রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম
২৫ মে ১৮৯৯	❖	কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম
২৪ মে ১৯২০	❖	গল্পকার সোমেন চন্দর জন্ম
২৫ মে ১৯২৪	❖	স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু
২৭ মে ১৯৬৪	❖	পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মৃত্যু

সংগীত বিষয়ে আলাপরত কাজী নজরুল ইসলাম। বাঁ থেকে রানু সোম (পরবর্তীকালে প্রতিভা বসু) এবং তাঁর মা সরযূবালা দেবী

প্রবন্ধ

কাজী নজরুল ইসলামের গজল

করুণাময় গোস্বামী

গজল মূলত ফার্সি গান। ইরানে এই গীতকলার অসামান্য বিকাশ ঘটে। ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে ভারতীয় সংগীতসংস্কৃতির সঙ্গে ফারসি সংগীতসংস্কৃতির সংযোগ ঘটলে শুধু ভারতীয় রাগসংগীতভাবনায়ই যে পারিবর্তন সাধিত হয় তা নয়, গজলের মত ফারসি সংগীত কলাও রাগসংগীতের প্রেক্ষিতে আচরণীয় হয়ে ওঠে এবং তা রাগসাংগীতিক রূপবন্ধসমূহের ক্রমে স্থান লাভ করে। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরির পরেই এর স্থান নির্দিষ্ট হয়। গজলকে অভিহিত করা হয় লঘু রাগসংগীতরূপে। ঠুংরিও প্রধানত লঘু রাগসংগীত।

ইরানে গজলের ঐতিহ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেখানকার বিশ্ববিশ্রুত কবিরা। কাব্য ও দার্শনিক গৌরবে এই গান তাঁদের রচনায় সুমহান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। গজল রচয়িতা ইরানি কবিরা ছিলেন মিস্টিক বা মরমী। মরমী গীতিকবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, এতে প্রায়শই অর্থাভাসের স্তরপর্যায় বর্তমান থাকে। আপাত অর্থের অন্তরালে থাকে এর গূঢ় অর্থ। এই গূঢ় অর্থটি প্রকাশ করাই রচয়িতার মূল লক্ষ্য। কিন্তু সরাসরি তিনি গূঢ় অর্থটির কথা বলছেন না। তিনি আপাত অর্থপূর্ণ জগতের বা ভাবের প্রতিরূপ তৈরি করছেন সেখানে। ফলে গানটি হয়ে উঠছে সেখানে রূপকার্থক। যদি কেউ চান এর আপাত অর্থটি নিয়ে তুষ্ট থাকতে, তিনি তা পারেন। কিন্তু সন্ধানী পাঠক্ শ্রোতাকে এর আপাত অর্থস্তরকে ভেদ করতেই হবে এর মর্মলোকে পৌঁছবার জন্য। গজলকে বলা হয় প্রেমসংগীত। ইরানী গজলও প্রেমেরই গান। তবে এই গান

গজল নরনারীর প্রেমের গান নয়। এ গান ঐশী প্রেমের গান। রূপকার্থক রচনা হিসেবে এর আপাত অর্থস্তরে একটি লৌকিক জগতের প্রেমচ্ছবি আছে। সেখানে আনুষঙ্গিক যা কিছু, যেমন ফুল, পাখি, সরাই, সাকি সবই নেওয়া হয়েছে জানাশোনা জগতের স্তর থেকে, যার ফলে নরনারীর প্রণয়সম্পর্কিত একটি লৌকিক জগৎ সেখানে আভাসিত হয়েছে গভীর সৌকর্যের সঙ্গে কিন্তু যথার্থত এই লৌকিক ব্যঞ্জনাটি মূল বক্তব্য নয়। একটি লোকোত্তর জগতের দ্যোতনা সৃষ্টি করাই কবির মূল লক্ষ্য।

মূলত নরনারীর প্রেমের গান নয়। এ গান ঐশী প্রেমের গান। রূপকার্থক রচনা হিসেবে এর আপাত অর্থস্তরে একটি লৌকিক জগতের প্রেমচ্ছবি আছে। সেখানে আনুষঙ্গিক যা কিছু, যেমন ফুল, পাখি, সরাই, সাকি সবই নেওয়া হয়েছে জানাশোনা জগতের স্তর থেকে, যার ফলে নরনারীর প্রণয়সম্পর্কিত একটি লৌকিক জগৎ সেখানে আভাসিত হয়েছে গভীর সৌকর্যের সঙ্গে কিন্তু যথার্থত এই লৌকিক ব্যঞ্জনাটি মূল বক্তব্য নয়। একটি লোকোত্তর জগতের দ্যোতনা সৃষ্টি করাই কবির মূল লক্ষ্য। ঈশ্বরের প্রতি মানুষের যে চিরকালীন ভালবাসা তাকে প্রকটিত করাই এখানকার মূল লক্ষ্য। গজল মূলত ঈশ্বরপ্রেমের গান। লৌকিক নায়ক এখানে রূপকার্থক মাত্র, সত্যার্থক নয়। ব্যাপারটা অনেকটা বৈষ্ণব পদাবলীর পুরুষপ্রকৃতি সম্পর্কের মত। এখানেও একটা আপাত জগৎ আছে, একটা আপাত প্রেমের ও অতি বিস্তৃত প্রেমানুষঙ্গের কথা আছে কিন্তু এগুলো প্রকৃত কথা নয়। প্রকৃত কথাটি হচ্ছে পরমপুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির বিচ্ছেদ যন্ত্রণা, এবং সে যে কেবলি তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে চাইছে সেটিই যথার্থ কথা। রাধাকৃষ্ণকাহিনির ভেতর দিয়ে সেই পুরুষ প্রকৃতি সম্পর্কের কথাটিকেই বলা হয়েছে বৃন্দাবনলীলার লৌকিক জীবনস্তরের ঘটনাপরম্পরাকে বিবৃত করে। দিলীপকুমার রায় গজলের এই দ্বিস্তরাভাস সম্পর্কে জানিয়েছেন: 'গজল গান গাওয়া হত প্রথম পারস্যদেশে। বলা বাহুল্য, ইরানীরা গজল গাইতেন ফারসি ভাষায়। ওর বিষয়– প্রণয়সংগীত। ওকে তাই বিশেষ করেই বলা চলে কাব্যসংগীত। কারণ, কাব্যের কেন্দ্ররসটিই ওর সুস্নেতা নে কুসুমিত, পল্লবিত, মর্মরিত হয়ে উঠেছে। পারস্যবিদরা বলেন ভাবের দিক দিয়ে গজলকে নাকি হতে হয় দ্ব্যর্থক: অর্থাৎ সাধক যদি চান ওর মধ্যে পাবেন পারমার্থিক ব্যঞ্জনা, আবার প্রণয়ী যদি চান ওর মধ্যে পাবেন নর নারীর প্রেমব্যঞ্জনা।' (দিলীপকুমার রায়, *সাঙ্গীতিকী*, কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৮, পৃষ্ঠা ৭৬) তবে নরনারীর প্রেমব্যঞ্জনার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয়লোকের পানে ধাবিত হওয়ার মধ্যেই নিহিত থাকে ফারসি গজলের প্রকৃত আকুতি। সেজন্যই দিলীপকুমার রায় জানান: 'গজলের মূল বাণীটি হল এই অপরোক্ষ অনুভবের বাণী– এই অতীন্দ্রিয় স্বপ্নমন্ত্র। ওর ভাব নিছক বিশ্বানুগ না– ও হল বিশ্বাতিগ। মাটিতে ওর জন্ম কিন্তু দৃষ্টি আকাশে। এই জন্যেই শ্রেষ্ঠশ্রেণীর পারস্য গজলকাব্য এত গভীর ব্যঞ্জনাময়।' (দিলীপকুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৪)

এমনি বাণীগৌরবে গরীয়ান গানের ক্ষেত্রে এটা খুবই স্বাভাবিক যে এখানে সুর প্রযুক্ত হবে কাব্যবাহিত ব্যঞ্জনাকে তীব্র করে তোলার জন্য। সুররূপায়ণের যে পৃথক একটি সৌকর্য আছে তা প্রদর্শনের স্থান এ নয়। এ গানের গায়নকলা স্বভাবতই হবে আবৃত্তিধর্মী।

কিন্তু হিন্দুস্তানী গানের গায়নকলার পরিপ্রেক্ষিত একটু ভিন্ন। হিন্দুস্তানী রাগসংগীত, যেমন ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি প্রভৃতি সুরপ্রধান বিষয়। গেয় সংগীতে কথাকে অবলম্বনমাত্র করে রূপবন্ধ অনুসারে রাগরূপ প্রতিষ্ঠাই সেখানকার বড় কথা। ফলে গজল যখন হিন্দুস্তানী সংগীতের ক্ষেত্রে আচরণীয় হয়ে উঠল, ঠিক হিন্দুস্তানী সুরপ্রধান সংগীতরীতি হিসেবে এর অভিষেক ঘটল না– কাব্যগীতিরূপে ঘটল এর প্রতিষ্ঠা। কথা ও সুরের মর্মানুসারী মিলনে গড়ে উঠতে চাইল এর যথার্থ প্রতিমা কিন্তু আদর্শ যদিও এই, তথাপি ভার তে এসে হিন্দুস্তানী গজলে না রক্ষা পেল ফারসি গজলের কাব্যাদর্শ, না রক্ষা পেল এর সংগীতাদর্শ। তবে একটা চেষ্টা চলল কাব্যগীতিরূপে এর স্বতন্ত্র মর্যাদা রক্ষা করার কিন্তু হিন্দুস্তানী রাগসংগীতের পটভূমিতে গজল প্রচলিত হলে কথা ও সুর উভয় ক্ষেত্রেই গুণগত পরিবর্তন দেখা দিল। প্রথমত হিন্দুস্তানী গজলরচয়িতাগণ ফারসি গজলের কাব্যিক উচ্চতা বজায় রাখতে অসমর্থ হন এবং দ্বিতীয়ত হিন্দুস্তানী সংগীতের সুররূপায়ণ প্রাধান্য গজলেও সংক্রমিত হয়। ফারসি গজলের যারা প্রাণপুরুষ তাঁদের সমকক্ষ রচয়িতা হিন্দুস্তানী গজলের ধারায় ছিলেন না এবং হিন্দুস্তানী সংগীতের ধারায় সুররূপায়ণের ঐতিহ্য এতই সুপ্রতিষ্ঠিত যে, এ থেকে ব্যতিক্রম হওয়া খুবই কঠিন ছিল। গজলের বক্তব্যগত প্রভেদও দেখা দেয় প্রবলভাবে। ফারসি গজল প্রেমসংগীত হলেও তা ঐশীপ্রেম সংগীত। মানবিক জগৎস্তর নেহাৎই এর ওপরকার কথা, ভেতরকার কথা নয় কিন্তু হিন্দুস্তানী গজল বা উর্দু গজল সম্পূর্ণতই মানবিক প্রেমের গান। নরনারীর প্রণয়সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায় যেমন অনুরাগ, মিলন, বিরহ এবং এদের সহযোগী বাহিরঙ্গিক পটভূমি হিসেবে প্রকৃতির বর্ণনা হয়ে উঠল এই গানের কেন্দ্রীয় বিষয়। এই রোমান্টিক বাণীবন্ধের সঙ্গে স্বভাবতই যুক্ত হল হিন্দুস্তানী রোমান্টিক সুরকলা। এই রোমান্টিক সাংগীতিকতার প্রতিভূ হচ্ছে ঠুংরি। ফলে ঠুংরির সংগীতসৌকর্যের কাছাকাছি এক ধরনের রোমান্টিক সাংগীতিকতা যুক্ত হল গজলের সঙ্গে। হিন্দুস্তানী সংগীতকলার পটভূমিতে গজল একটি নতুন ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেল।

দিলীপকুমার রায় তাঁর *সাঙ্গীতিকী* গ্রন্থের 'গজল' অধ্যায়ে হিন্দুস্তানী সংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে গজলের নবরূপগ্রহণ সম্পর্কে জানিয়েছেন: 'পারস্য গজল ভারতে এসে নিল এক নবরূপ। ইরানি সংগীতের সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের কিছু মিল আছে কিন্তু খুব বেশি নয়। ভারতীয় সংগীতের ঐশ্বর্য তার নেই– বিচিত্র বিকশিত রাগসম্পদ তো নেইই। তাই ভারতে পার্সি গজল উর্দু গজলে পেয়েছে নবজন্ম, ভারতীয় সংগীতের ভূমিকায়।

শ্রেষ্ঠ উর্দু গজলে বিশ্বাতিগ ভাব কিছু আছে সত্য কিন্তু ইরানি সুফী গজলের সৌরভ, সরসতা ও স্বপ্নালুতা নেই। তবু শ্রেষ্ঠ উর্দু গজলের মধ্যে একধরনের চিত্রভঙ্গি ও সৌকুমার্য আছে যা সময়ে সময়ে মুগ্ধ করে কিন্তু দুঃখ এই যে, উৎকৃষ্ট উর্দু গজল সংখ্যায় অত্যন্ত কম। শুধু তাই না– শতকরা নিরানব্বইটি উর্দু গজলের ভাব অত্যন্ত সস্তা, প্রেমজ্ঞাপনের ভঙ্গি অত্যন্ত মামুলি, দয়িতের রূপবর্ণনার পদ্ধতি সময়ে সময়ে অত্যন্ত অরুচিকর। উল্টো দিকে উর্দুতে দার্শনিক গজল হয়ে উঠেছে সাংঘাতিক গুরুগম্ভীর– হিন্দুস্তানি গজলে অতীন্দ্রিয়বোধ প্রায়ই হয়ে উঠেছে কথার প্রতিধ্বনি। সুতরাং ইরানি গজলের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আলো, অপরোক্ষ উপলব্ধির স্বর্ণরাগ তার উর্দু জাতভাইয়ের মুখে ফলেছে ধার করা আভায়, গিল্টি চাকচিক্যে। উর্দু গজল তাই একদিকে প্রগল্‌ভ ছোপলা– অন্যদিকে অত্যন্ত গম্ভীরানন, গজেন্দ্রগামী।' (দিলীপকুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৫)

উর্দু গজল প্রসঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুব জানান: 'অন্যান্য ভাষার গীতিকাব্যে যেমন, উর্দু গজলেও তেমিন রোমান্টিক প্রেমের আসন খুবই বিস্তৃত। বস্তুতপক্ষে একমাত্র বিষয় না হলেও প্রেমই গজলের প্রাণকেন্দ্র। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি– বিশেষত যে সৌন্দর্যকে একাধারে ভয়ংকর ও মহিমান্বিত (ইংরেজিতে সাব্লাইম) বলা যায়, তার প্রতি ভাবাবেগ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলীর সমসাময়িক কবি গালিবে অনুপস্থিত; এবং সেটা খুব আশ্চর্য নয়। উর্দু সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্র দিল্লি

ফারসি গজলের প্রেরণায় ভারতে হিন্দুস্থানী লঘু রাগসংগীতের ধারায় উর্দু গজলের ধারার সূত্রপাত এবং কাব্যবৈভবে উর্দু গজল ফার্সি গজলের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি, কিন্তু সুরগৌরবে সে তার বাণীর দৈন্যকে ঢাকতে পেরেছে বহুলাংশে। শ্রেষ্ঠ গজল রচয়িতাদের কথা বাদ দিলেও, সাধারণ গজল রচয়িতাদের রচনাও সুরের গৌরবে চিত্তজয় করেছে কিন্তু এ ব্যাপারে সব চেয়ে উলেস্নখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, ফারসি প্রেরণাকে সম্বল করে ভারতবর্ষে শিল্পকলার য়্যাকিছু বিকাশ ঘ টেছে, গজলের বিকাশ তার

আগ্রা লখনৌ থেকে সমুদ্র হাজার মাইল দূর, হিমালয় অপেক্ষাকৃত নিকট হলেও দেড়শোদু শো মাইল পার হতে হয় তার মহিমা উপলব্ধি করার জন্য। তখন, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, যানবাহনের ব্যবস্থা এমনই ছিল যে উর্দু কবিদের পক্ষে হিমালয় ভ্রমণ করে আসা আজকালকার অনেক বাঙালি কবির পক্ষে নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখে আসার চেয়ে কম দুঃসাধ্য ছিল না। আশেপাশে এই কবিরা দেখতে পেতেন ধূধূ করা মাঠ, কোথাও কোথাও কৃষিক্ষেত্র এবং যমুনার মত ক্ষীণপ্রাণ শীর্ণকায় নদী। সেই যমুনারই তীরে ছিল শাহজাহানের মর্মবেদনা ব্যঞ্জক এক অত্যাশ্চর্য স্থাপত্যের নিদর্শন, বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিকে তা গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল, কিন্তু উর্দুর শ্রেষ্ঠ কবির গজলে সাড়া জাগাতে পারেনি।...

বাগান আর ফুলের কথা অবশ্য উর্দু গজলে ছড়ানো রয়েছে, কিন্তু সে ফুলগুলি প্রায়শই কাগজের ফুল, অর্থাৎ প্রাক্তন কাব্যের পাতা থেকে তুলে আনা, ইরান থেকে ঐতিহ্যবাহী সড়কে কব্লিপর স্পরায় আমদানী করা। তাই লালহ্ ও গুল, নার্গিস ও য়াসমীনের পৌনঃপুনিক উল্লেখ উর্দু গজলে কিঞ্চিৎ কৃত্রিম ঠেকে।' (আবু সয়ীদ আইয়ুব, *গালিবের গজল থেকে*, কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬)।

ফারসি গজলের প্রেরণায় ভারতে হিন্দুস্তানী লঘু রাগসংগীতের ধারায় উর্দু গজলের ধারার সূত্রপাত এবং কাব্যবৈভবে উর্দু গজল ফার্সি গজলের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি, কিন্তু সুরগৌরবে সে তার বাণীর দৈন্যকে ঢাকতে পেরেছে বহুলাংশে। শ্রেষ্ঠ গজল রচয়িতাদের কথা বাদ দিলেও, সাধারণ গজল রচয়িতাদের রচনাও সুরের গৌরবে চিত্তজয় করেছে কিন্তু এ ব্যাপারে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, ফারসি প্রেরণাকে সম্বল করে ভারতবর্ষে শিল্পকলার য়্যাকিছু বিকাশ ঘ টেছে, গজলের বিকাশ তার মধ্যে মহত্তম ঘটনা। সুদীর্ঘকাল ধরে শতশত কবির রচনাকে অবলম্বন করে এখানে গজলের এক বিপুল ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। উর্দু ছাড়া অন্যান্য ভাষার গানেও এর প্রভাব পড়েছে এবং স্লেসব ভাষায় গীতরচনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচনে সহায়ক হয়েছে।

দিলীপকুমার রায় বাংলায় গজল রচনার উপযোগিতা ও এর উজ্জ্বল সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন: 'স্লেসব সুর বাংলা সংগীতে আসলে বাংলা গজল ও সুরমহল সমৃদ্ধ হবে সন্দেহ নেই। এর নজির 'কত গান তো হল গাওয়া' প্রমুখ গজল। এ শ্রেণীর গজল আরো রচিত হবে এ্লভরসা হয় এই জ ন্যে যে বাংলাদেশে গজলের আদর শুরু হয়েছে। গজলের ঢঙে উৎকৃষ্ট ভাবাত্মক বাংলা কাব্যে যদি বাঙালির কল্পনা সুরের যোগান দেয় তবে বাংলা কাব্যসংগীতে গজল এক নব বিকাশে গরীয়ান হয়ে উঠবে সন্দেহ কি-...

গজল সম্বন্ধে এত আলোচনা করছি তার একটা প্রধান কারণ এই যে, গজলে উচ্চশ্রেণীর কাব্যসংগীত রচনা হতে পারে বলে এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, এমন কথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। গজলের ছন্দোবন্ধেরও যে রকমফের হতে পারে তারও দুএকটি দৃষ্টান্ত দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম আরো এই জন্যে যে, গজলে সুকুমার কাব্যরসিকরা কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা বোধ করেন। করার কারণ আছে একথা ইতিপূর্বেই মেনে নিয়েছি উর্দু গজলের সম্পর্কে কিন্তু একটা মস্ত কাব্যসংগীতের ধারাকে তার নিকৃষ্ট নমুনা দেখে বাতিল করলেও তার পরে অবিচার হয়। গজল সম্বন্ধে তাই কাব্যানুরাগীদের দৃষ্টি বিশেষ করেই আকর্ষণ করা উচিত মনে করি- আরো এই জন্যে যে, গজলের এই শ্লোকভঙ্গিতে গানের গানত্ব খুবই সুন্দর ফোটে, যেহেতু এ্লভ ঙ্গিতে মূল ভাবটিকে ছন্দের মন্ত্রে সুরের ইন্দ্রজালে সজীব করে তোলার অবকাশ যথেষ্ট মেলে। গানের ভাবটি যদি সোজা তীরের মতন হৃদয়ে পৌঁছতে পায় তবে সুরের ব্যঞ্জনার জাদুতে তার ছবিটিকে উজ্জ্বল করে তোলা সহজ হবারই তো কথা। গজলের রচনাচাতুরীর প্রাণের কথাও ছিল এইই। ইরানি গজল চর্চা করতে গেলে একথা খুব বেশিই মনে হয়- যদিও একথা সত্য যে উর্দু গজলে এ্লসু ন্দর আইডিয়াটি সাড়ে পনেরো আনা ক্ষেত্রেই ফুটে উঠতে পারেনি, কারণ উর্দু গজলকারদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কবি নেই বললেই হয় কিন্তু কবিত্ব বাঙালির স্বধর্ম- তাই শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবিদের কাছে আবেদন- তাঁরা এখন একটু এদিকে মন দিন ও হাল্কা ঠুনকো গজল ছেড়ে ভাবগম্ভীর গজল রচনায় ব্রতী হোন, বাংলা সংগীতের একটা বড় অভাব পূর্ণ হোক। (দিলীপকুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯০৯১)

দিলীপ রায় যখন এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন, তখন বাংলায় গজল রচনার পর্বটি শুরু হয়ে গেছে। তিনি 'কত গান তো হল গাওয়া' গজলটির উল্লেখ করেছেন। এটি অতুলপ্রসাদ সেন রচিত একটি গজল শ্রেণীর গান। অর্থাৎ বাংলা গজল রচনা মাত্র শুরু হয়েছে এমন একটি সময়ে দিলীপ রায় অতুলপ্রসাদের এই গানটির প্রশংসা করে বাংলা গজলের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেন।

বাংলায় প্রথম গজল রচনা করেন অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)। আইনব্যবসায় সূত্রে তিনি থাকতেন হিন্দুস্তানী সংগীত ও গজলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র লখনৌয়ে। রাগসংগীতে অতুলপ্রসাদের অপার উৎসাহ ছিল। বিশেষ করে তিনি ছিলেন ঠুংরির গভীর অনুরাগী। লঘুরাগসংগীতমনস্কতার জন্য গজলের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। তদুপরি অতুলপ্রসাদ খুব ভাল উর্দু জানতেন। ফলে গজলের রসগ্রাহিতার পক্ষে যাবতীয় পরিস্থিতিই তাঁর পক্ষে অনুকূল ছিল। তিনি বাংলায় গজল রচনায় মনোনিবেশও করেছিলেন। অতুলপ্রসাদের 'কত গান তো হল গাওয়া'কে তাঁর শ্রেষ্ঠ গজল রচনা বলে উল্লেখ করেছেন সবাই। সে বিবেচনায় এটিই বাংলা ভাষার প্রথম উল্লেখযোগ্য গজল। গানটি হচ্ছে:

কত গান তো হল গাওয়া
আর মিছে কেন গাওয়াও?
যদি দেখা নাহি দিবে
তবে মিছে কেন চাওয়াও?
যদি যতই মরি ঘুরে
তুমি ততই রবে দূরে
তবে কেন বাঁশির সুরে
তব তরে শুধু ধাওয়াও?
যদি সন্ধ্যা হলে বেলা
নাহি মিলে তব বেলা
পথ ভোলা মোর ভেলা
এ অকূলে কেন বাওয়াও?
যদি আমার দিবারাতি
কাটি যাবে বিনা সাথি
তবে কেন বঁধুর লাগি
পথপানে শুধু চাওয়াও?

অতুলপ্রসাদ এ কয়টি গজল রচনা করলেও বাংলা গানের ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টির মত প্রাবল্য আনতে পারেননি। তিনি থাকতেন বাংলা থেকে বহু দূরে। কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা গানের জগতের সঙ্গে তাঁর তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। বাঙালি শ্রোতৃসমাজের ওপরও তাঁর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল না।

কাজী নজরুল ইসলামই বাংলা গানের ইতিহাসে গজল যুগের প্রবর্তন করেন। রচিত গানের পরিমাণ, সমসাময়িক শ্রোতৃসমাজের ওপর প্রভাব, সংগীত সমালোচকদের প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি নানা বিষয় বিবেচনা করেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। বাংলায় যে গজল রচিত হতে পারে এবং রচিত হলে শ্রোতৃচিত্ত যে এমন বিপুল আনুকূল্য প্রদর্শন করতে পারে এবং সামগ্রিকভাবে বাংলা গান যে এই নতুন সংগীতধারা দ্বারা প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ হতে পারে তা বোঝা গেল নজরুলের রচনার

বড়ো ব্যথা তোমায় চাওয়া
আরো ব্যথা ভুলে যাওয়া
যদি ব্যথী না আসিবে
এত ব্যথা কেন পাওয়াও?

এছাড়া অতুলপ্রসাদ আরো কয়েকটি গজল রচনা করেছিলেন। সেসবের মধ্যে রয়েছে 'কে গো তুমি বিরহিণী, আমারে সম্ভাষিলে/এ পোড়া পরানতরে এত ভালবাসিলে', 'রাতারাতি করল কে রে ভরা বাগান ফাঁকা/রাঙা পায়ের চিহ্ন শুধু আঙিনাতে আঁকা', 'ভাঙা দেউলে মোর কে আইলে আলো হাতে/বলে দিল কে পথ এ কালো রাতে', 'জল বলে চল মোর সাথে চল/কখনো তোর আঁখিজল হবে না বিফল' প্রভৃতি গান।

অতুলপ্রসাদ এ কয়টি গজল রচনা করলেও বাংলা গানের ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টির মত প্রাবল্য আনতে পারেননি। তিনি থাকতেন বাংলা থেকে বহু দূরে। কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা গানের জগতের সঙ্গে তাঁর তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। বাঙালি শ্রোতৃসমাজের ওপরও তাঁর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল না। তাছাড়া তাঁর রচিত গজল সংখ্যায় এতই অল্প এবং শ্রোতাসাধারণ তাদের এত কম শুনতে পেয়েছেন যে, বাংলা কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রে নতুন ধারা প্রবর্তন বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু তাঁর দ্বারা সাধিত হয়নি। তবে ইতিহাসের কথা বলতে গেলে একথা বলতেই হবে যে বাংলায় গজল রচনায় প্রথম ব্রতী হয়েছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন।

তবে কাজী নজরুল ইসলামই বাংলা গানের ইতিহাসে গজল যুগের প্রবর্তন করেন। রচিত গানের পরিমাণ, সমসাময়িক শ্রোতৃসমাজের ওপর প্রভাব, সংগীত সমালোচকদের প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি নানা বিষয় বিবেচনা করেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। বাংলায় যে গজল রচিত হতে পারে এবং রচিত হলে শ্রোতৃচিত্ত যে এমন বিপুল আনুকূল্য প্রদর্শন করতে পারে এবং সামগ্রিকভাবে বাংলা গান যে এই নতুন সংগীতধারা দ্বারা প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ হতে পারে তা বোঝা গেল নজরুলের রচনার মাধ্যমেই।

করাচি থেকে কলকাতা ফিরে আসার পর বুলবুলের জন্মাবধি (সেপ্টেম্বর ৮, ১৯২৬) সংগীত রচয়িতারূপে নজরুল ইসলামের যে কর্মপর্যায় তাতে আমরা তাঁকে দেখতে পাই প্রধানত দেশাত্মবোধক গীতরচয়িতা হিসেবে। কিন্তু ১৯২৬ সালের শেষের দিক থেকেই তিনি গজল রচনায় মনোনিবেশ করলেন। নলিনীকান্ত সরকার জানিয়েছেন যে, নজরুল দু'টি হিন্দুস্তানী ভিখারীর মুখে গজল শুনে তাঁর বাড়িতে বসেই প্রথম গজল রচনা করেন। তিনি বলেন: 'দুটি হিন্দুস্তানী পথচারী ভিখারী– একজন পুরুষ, অপরটি নারী হারমোনিয়ামের সঙ্গে উর্দু গজল গেয়ে ঊর্ধ্বমুখে চলেছে সারা পল্লীতে মধু বর্ষণ করতে করতে। নজরুলের একান্ত আগ্রহে আমার বৈঠকখানায় তাদের ডেকে এনে গান শোনাবার ব্যবস্থা হল। অনেকগুলি গান শুনিয়ে তারা বিদায় নিল।

নজরুল তক্ষুণি বসলেন গান লিখতে। তাদের 'জাগো পিয়া' গানটির রেশ তখনও আমাদের কানে যেন ধ্বনিত হচ্ছে। এই গানের সুর অবলম্বন করে নজরুল কয়েক মিনিটের মধ্যে লিখে ফেললেন– 'নিশি ভোর হল জাগিয়া, পরাণপিয়া' গানটি।

তাঁর গজল গান লেখার শুরু এইখানে থেকে। গজল গানের নেশা তাঁকে যেন পেয়ে বসল। অসি ছেড়ে বাঁশি ধরবার জন্যে কয়েকজন উগ্রপন্থী ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করেছিলেন যথেষ্ট। রসের সন্ধান পেলে কবিপ্রাণের অপ্রতিহত গতিমুখে সকল বাধাই তৃণখণ্ডের মত ভেসে যায়। এক্ষেত্রেও তাই হল।' (নলিনীকান্ত সরকার, দুটি ছোট গল্প, *নজরুলস্মৃতি*, বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, কলকাতা: সাহিত্যম, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৪৫)

তথ্যাদি দৃষ্টে যা মনে হয় তাতে 'নিশি ভোর হল জাগিয়া পরাণপিয়া' নজরুলের প্রথম গজল রচনা নয় এবং এটি নলিনীকান্ত সরকারের বাড়িতে বসেও কবি রচনা করেননি। নজরুল ইসলামের প্রথম রচিত গজল সম্পর্কে যেটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায় যে, 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল' গানটির কথাই আসে প্রথম। ১৩৩৩ সালের ৮ অগ্রহায়ণ এটি কৃষ্ণনগরে রচিত হয়।

১. 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল' গজলটি ৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ কৃষ্ণনগরে রচিত ও ১৩৩৩ মাঘের *কল্লোলে* প্রকাশিত হয়।
২. 'আসে বসন্ত ফুলবনে' গজলটি ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ কৃষ্ণনগরে রচিত হয়।
৩. 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে' গজলটি ১৩৩৩ ফাল্গুনের *কল্লোলে* প্রকাশিত হয়।
৪. 'দুরন্ত বায়ু বহে পূরবইয়া' ১৩৩৩ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। রচনাকাল ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ কৃষ্ণনগর।
৫. 'আমারে চোখ্ইশারায় ডাক দি লে হায়' ১৩৩৩ এর চৈত্রের *কল্লোলে* প্রকাশিত হয়।
৬. 'মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে' ১৩৩৩ এর মাঘের *কল্লোলে* প্রকাশিত হয়।
৭. 'ভুলি কেমনে আজো যে মনে' ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠের *কল্লোলে* প্রকাশিত হয়।
৮. 'করুণ কেন অরুণ আঁখি' ও 'এত জল ও কাজল চোখে' গজল দু'টি ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠের *বঙ্গবাণী*তে প্রকাশিত হয়। গান দু'টির কবিকৃত স্বরলিপি ১৩৩৪ আষাঢ় ও আশ্বিনের *নওরোজে* প্রকাশিত হয়।
৯. 'কেন কাঁদে পরাণ' ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসে *নওরোজে* প্রকাশিত হয়।
১০. 'আসিলে এ ভাঙা ঘরে' ১৩৩৪ সালে *নওরোজে*র শ্রাবণ সংখ্যায় কবিকৃত স্বরলিপিসহ প্রকাশিত হয়।
১১. 'চেয়ো না সুনয়না আর চেয়ো না এ নয়ন পানে'

নজরুল ইসলাম হাফিজের গজল অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন তাঁর বিষের বাঁশী কাব্যের অন্তর্ভুক্ত কবিতা ও গান রচনার সমসাময়িক কালে। দীওয়ান্ইহাফিজ্এর অ ন্তর্ভুক্ত যে কয়টি গজল তখন নজরুল অনুবাদ করেন তার মধ্যে ১ ও ২ সংখ্যক গজল ১৩২৭ অগ্রহায়ণ সংখ্যা মোসলেম ভারত, ৩ ও ৪ সংখ্যক গজল ১৩২৭ পৌষ, ৫ ও ৬ সংখ্যক গজল ১৩২৭ মাঘ সংখ্যা মোসলেম ভারত্এ প্রকাশিত হয়।

১৩৩৪ অগ্রহায়ণের *সওগাতে* প্রকাশিত হয়।

১২. 'কে বিদেশী মন্নউদাসী ' ১৩৩৪ পৌষের *সওগাতে* প্রকাশিত হয়। এই গানের কবিকৃত স্বরলিপি চৈত্র সংখ্যা *সওগাতে* প্রকাশিত হয়।

১৩. 'নিশি ভোর হল জাগিয়া' ১৩৩৪ চৈত্রের *প্রগতি*তে প্রকাশিত হয়।

১৪. 'কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে' ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠের *সওগাতে* প্রকাশিত হয়।

১৫. 'এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো' ১৩৩৫ বৈশাখের *প্রগতি*তে কবিকৃত স্বরলিপিসহ প্রকাশিত হয়।

১৬. 'নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল' ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠের *কালিকলমে* প্রকাশিত হয়।

১৭. 'কেন আন ফুলডোর' ১৩৩৫ এর অগ্রহায়ণে রচিত, ১৩৩৫ মাঘের *সওগাতে* প্রকাশিত হয়।

১৮. 'কেমনে রাখি আঁখিবারি চাপিয়া' ১৩৩৫ ফাল্গুনের *সওগাতে* প্রকশিত হয়।

গীতগ্রন্থ *বুলবুল* ১৩৩৫ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। *বুলবুল* গজল সংকলনরূপে বিখ্যাত। নজরুল জীবনের গজলযুগে রচিত শ্রেষ্ঠ গজলসমূহ এই গ্রন্থের অন্তর্গত। এই যুগেই গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার ফলে নজরুলকে নানা ধরনের গান রচনায় মনোনিবেশ করতে হয়। গজল রচনায় ভাটা পড়ে। শেষের দিকে গজল রচনা পরিত্যক্ত হয়। *বুলবুল*-পরবর্তী গীতসংকলনসমূহেও কিছু গজল অন্তর্ভুক্ত হয়।

যদিও নজরুল ইসলাম গজল রচনা করতে শুরু করেন ১৯২৬ সালের শেষের দিক থেকে, প্রকৃতপক্ষে তিনি এই গীতরূপ সম্পর্কে উৎসাহিত বোধ করেন আরো অনেক আগে থেকেই, তখন তিনি সেনাদলে যোগ দিয়ে করাচি রয়েছেন। তাঁর উৎসাহের প্রধান উৎস ছিল মরমী কবি হাফিজের গজলসমূহ। একথা নজরন্নল জানিয়েছেন তাঁর রু*বাইয়াৎইহাফিজ* এর মুখব ন্ধে:

'আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরেজী ১৯১৭ সালের কথা। সেই খানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি *দীওয়ান্ইহাফিজ* থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি শিখতে আরম্ভ করি। তাঁর কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত কাব্যই পড়ে ফেলি।

তখন থেকেই আমার হাফিজের দিওয়ান অনুবাদের ইচ্ছা হয়। কিন্তু তখনো কবিতা লিখবার মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। এর বছর কয়েক পর হাফিজের দীওয়ান অনুবাদ করতে আরম্ভ করি। অবশ্য তাঁর রুবাইয়াৎ নয়– গজল। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তা প্রকাশিতও হয়েছিল। ত্রিশপঁয়ত্রিশটি গজল অনুবাদের পর আর আমার ধৈর্যে কুলোল না এবং ঐখানেই ওর ইতি হয়ে গেল। তারপর এস সি চক্রবর্তী এন্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের জোর তাগিদে এর অনুবাদ শেষ করি।'

*রুবাইয়াৎইহা ফিজ্*এর শেষে সংযোজিত 'মরমী কবি হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনীর একস্থানে হাফিজের গজল প্রসঙ্গে নজরুল বলেন, 'তাঁহার কবিতার অধিকাংশই গজল গান বলিয়া লেখা হইবামাত্র মুখে মুখে গীত হইত। ধর্মমন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া পানশালা পর্যন্ত সকল স্থানেই তাঁহার গান আদরের সহিত গীত হইত।

হাফিজের গান অতল গভীর সমুদ্রের মত। কূলের পথিক যেমন তাহার বিশালতা, তরঙ্গলীলা দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে, অতল তলের সন্ধানী ডুবুরী তেমনি তাহার তলদেশে অজস্র মণিমুক্তার সন্ধান পায়। তাহার উপরে যেমন ছন্দ্নর্তন, বিপুল বিশালতা, নিম্নে তেমনি অতল গভীর প্রশান্তি, মহিমা।

আকাশের নীল পেয়ালা উপচিয়া আলোর শিরাজী ধরণীতে গড়াইয়া পড়ে, উন্মত্ত ধরণী নাচিয়া নাচিয়া শূন্যে ঘুরিয়া ফেরে। তারকার মণ্মািণিক্যখচিত আকাশ পেয়ালার সাকীকে কবি ডাকে, শরাব ভিক্ষা করে আর গান গায়– 'বদেহ সাকী ময়ে বাকী'! ওগো সাকী, আরো– আরো শরাব ঢাল। কিছুই বাকী রাখিও না। পাত্র উজাড় করিয়া শরাব ঢাল।'

নজরুল ইসলাম হাফিজের গজল অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন তাঁর *বিষের বাঁশী* কাব্যের অন্তর্ভুক্ত কবিতা ও গান রচনার সমসাময়িক কালে। *দীওয়ান্ইহাফিজ* এর অন্তর্ভুক্ত যে কয়টি গজল তখন নজরুল অনুবাদ করেন তার মধ্যে ১ ও ২ সংখ্যক গজল ১৩২৭ অগ্রহায়ণ সংখ্যা *মোসলেম ভারত*, ৩ ও ৪ সংখ্যক গজল ১৩২৭ পৌষ, ৫ ও ৬ সংখ্যক গজল ১৩২৭ মাঘ সংখ্যা *মোসলেম ভারত*এ প্রকাশিত হয়। ৭ সংখ্যক গজল ১৩৩০ শ্রাবণের *প্রবাসী* এবং ৮ সংখ্যক গজল ১৩৩০ বৈশাখ সংখা *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়* প্রকাশিত হয়। ৯ সংখ্যক গজল *নির্ঝর* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সে গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয়নি।

গীতসংকলন *বুলবুল* প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নজরুল ইসলাম গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগদান করেন। সেখানে বিশেষ কোন সাংগীতিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাঁর পক্ষে কাজ করা সম্ভব হয়নি। কোম্পানির চাহিদামত এবং গায়কগায়িকা দের ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি গান রচনা করতেন। ফলে তাঁর সংগীত রচনার ধারাটি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। নানা ধরনের বা প্রায় সবধরনের বাংলা গান রচনা করলেও আধুনিক শ্রেণীর গান রচনায়ই নজরুলকে মনোযোগ দিতে হয় বেশি। ফলে গজল রচনার যে অসাধারণ সম্ভাবনাময় ধারাটির সূচনা করেছিলেন তিনি, তাকে যথাযথ প্রাবল্যের সঙ্গে তিনি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। তথাপি নানা গানের ভিড়ের মধ্যেও তিনি গজল রচনা করেন। *চোখের চাতক* (১৯২৯), *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০), *সুরসাকী* (১৯৩১), *বনগীতি* (১৯৩২), *গুলবাগিচা* (১৯৩৩), *গীতিশতদল* (১৯৩৪), *গানের মালা*

গীতসংকলন বুলবুল প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নজরন্নল ইসলাম গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগদান করেন। সেখানে বিশেষ কোন সাংগীতিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাঁর পক্ষে কাজ করা সম্ভব হয়নি। কোম্পানির চাহিদামত এবং গায়কগায়িকা দের ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি গান রচনা করতেন। ফলে তাঁর সংগীত রচনার ধারাটি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। নানা ধরনের বা প্রায় সবধরনের বাংলা গান রচনা করলেও আধুনিক শ্রেণীর গান রচনায়ই নজরুলকে মনোযোগ দিতে হয় বেশি।

একান্তভাবে সংগীত রচয়িতারূপে নজরুলের যে বিপুল খ্যাতি, তার সূচনা গজলপর্ব থেকেই। এর আগে তিনি উদ্দীপনাময় দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন। জনপ্রিয়তার সঙ্গে সেসব গান সভায় ও মিছিলে গাওয়া হয়েছে। তবে সেসব গা নের পেছনে কোন সাংগীতিক বিবেচনা ছিল না, ছিল বিদ্রোহী কবির সমাজপরিবর্তনের অঙ্গীকার। গজলে এসেই নজরুল একান্তরূপে সংগীতরচয়িতা হিসেবে দেখা দিলেন এবং দেখা দেওয়ামাত্রই বিপুলভাবে অভিনন্দিত হলেন।

(১৯৩৪) প্রভৃতি গীতসংকলনেও নজরুলরচিত কিছু কিছু গজল অন্তর্ভুক্ত হয়।

একান্তভাবে সংগীত রচয়িতারূপে নজরুলের যে বিপুল খ্যাতি, তার সূচনা গজলপর্ব থেকেই। এর আগে তিনি উদ্দীপনাময় দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন। জনপ্রিয়তার সঙ্গে সেসব গান সভায় ও মিছি লে গাওয়া হয়েছে। তবে সেসব গা নের পেছনে কোন সাংগীতিক বিবেচনা ছিল না, ছিল বিদ্রোহী কবির সমাজপরিবর্তনের অঙ্গীকার। গজলে এসেই নজরুল একান্তরূপে সংগীতরচয়িতা হিসেবে দেখা দিলেন এবং দেখা দেওয়ামাত্রই বিপুলভাবে অভিনন্দিত হলেন। বাংলা শীলিত সংগীতের তখনকার পরিস্থিতিতে গজল ছিল একটি ব্যতিক্রমী বিষয়। এই ব্যতিক্রমী সংগীতসৌন্দর্য এতই চিত্তহারী হয়েছিল যে তার ফলাফলের জন্য কবিকে মোটেই অপেক্ষা করতে হয়নি। গীত হওয়ামাত্র শ্রোতৃসাধারণ তাকে পরম আদরে বরণ করে নিল। গজলের অভিনব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এর প্রচারে ব্রতী হলেন দিলীপকুমার রায়, নলিনীকান্ত সরকার, সাহানা দেবী প্রমুখ বরেণ্য গায়কগায়িকা। দিলীপ রা য়ের ভূমিকাটি নজরুলের গজলের প্রতি রসজ্ঞ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। গজল রচয়িতারূপেই নজরুল বিপুল সংগীতখ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং এই খ্যাতির পরিপ্রেক্ষিতেই গ্রামোফোন কোম্পানি নজরুলকে এর সংগীতকাররূপে নিযুক্ত করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

নজরুলের গজল রচনাকে দু'টি প্রধানভাগে ভাগ করা হয়। একটি ভাগে থাকবে ফারসি গজলের অনুবাদ এবং ফারসি গজলের বিষয় ও অনুষঙ্গের পটভূমিতে রচিত গজল এবং দ্বিতীয় ভাগে থাকবে বাংলা কাব্যগীতির ঐতিহ্যানুসারী জীবন ও প্রকৃতির অনুষঙ্গে রচিত গজল। প্রথম ভাগে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এমন কয়েকটি গজল হচ্ছে:

১. কানন গিরি সিন্ধু পার ফিরনু পথিক দেশ্লবি দেশ
২. তরুণ পথিক প্রণয় বেদন/জানাও জানাও ব্লেদিল প্লি য়ায়
৩. আসল যখন ফুলের ফাগুন, গুলবাগে ফুল চায় বিদায়
৪. করুণ কেন অরুণ আঁখি দাওগো সাকী দাও শরাব
৫. তোমার আঁখির কসম সাকী, চাহি না মদ আঙুরপেষা
৬. গুল্লবাগিচার বুলবুলি আমি, রঙীন প্রেমের গাই গজল
৭. গোলাব ফুলের কাঁটা আছে সে গোলাব শাখায়
৮. আনো সাকী শিরাজী আনো আঁখি পিয়ালায়
৯. শূন্য আজি গুল্লবাগিচা যায় কেঁদে দখিন হাওয়া
১০. আন গোলাপ পানি আন আতরদানি গুলবাগে

দ্বিতীয় বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এমন কয়েকটি গজল হচ্ছে:

১. কে বিদেশী মন্নউদাসী
২. আমারে চোখ্লইশারায় ডাক দি লে হায় কে গো দরদী
৩. বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
৪. ভুলি কেমনে আজো যে মনে
৫. এত জল ও কাজল চোখে
৬. আসে বসন্ত ফুলবনে
৭. চেয়ো না সুনয়না আর চেয়ো না এ নয়ন পানে
৮. নিশি ভোর হল জাগিয়া
৯. নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল
১০. এ আঁখিজল মোছ পিয়া
১১. কেন আন ফুলডোর আজি বিদায় বেলা
১২. কেমনে রাখি আঁখিবারি চাপিয়া
১৩. মুসাফির! মোছরে আঁখিজল
১৪. এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছে জলে কমল
১৫. কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
১৬. মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
১৭. ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা সনে রহিল আঁকা
১৮. রুমুঝুমু রুমুঝুমু কে এলে নূপুর পায়
১৯. পানসে জোছনাতে কে চল গো
২০. দিতে এলে ফুল হে প্রিয়
২১. পথ চলিতে যদি চকিতে
২২. আধো আধো বোল লাজে
২৩. ঐ জলকে চলে লো কার ঝিয়ারী
২৪. আমার যাবার সময় হল দাও বিদায়
২৫. পাষাণের ভাঙালে ঘুম কে তুমি
২৬. তোমার বুকের ফুলদানীতে
২৭. বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল

গজলের রচনাগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্লোকভঙ্গিমা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুই চরণে গঠিত স্তবকক্রমে গজলের পদ গঠিত হয়। দিলীপকুমার রায় একে বলেছেন, 'গজলের একটি প্রধান রূপভঙ্গি হল শ্লোকে শ্লোকে জোড় পায়ে এগিয়ে চলা– দু'টি করে চরণে একটি করে মূল ভাবের ছবি ফুটিয়ে তোলা। কেউ কেউ বলেন ক্রমাগত এই একই ভঙ্গিতে গান রচনা করলে বৈচিত্র্যের অভাবে ছন্দ ক্রমশ মনমরা মতন হয়ে পড়ে, প্রবহমানতার অভাবে ধ্বনির কল্লোল ক্ষীয়মান হয়ে আসে, পরিণামে হালকা গানই ওঠে– বুদ্বুদের মতন। কিন্তু ইরানি গজলের নজির একথার জলন্ত প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়িয়ে।' (দিলীপকুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৬) স্তবকগঠনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এক একটি স্তবকে এক একটি ভাবের পূর্ণতা বিধান করা হয়। সম্পূর্ণ পদের সঙ্গে শ্লোক বা স্তবক বা শেরসমূহ রচনাগতভাবে যুক্ত থাকলেও ভাবের দিক থেকে এগুলো অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। স্তবকক্রমে পূর্ণ বাণীর পাঠটি যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পৃথকভাবে এক একটি স্তবকও উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

* পরবর্তী সংখ্যায়

করুণাময় গোস্বামী শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

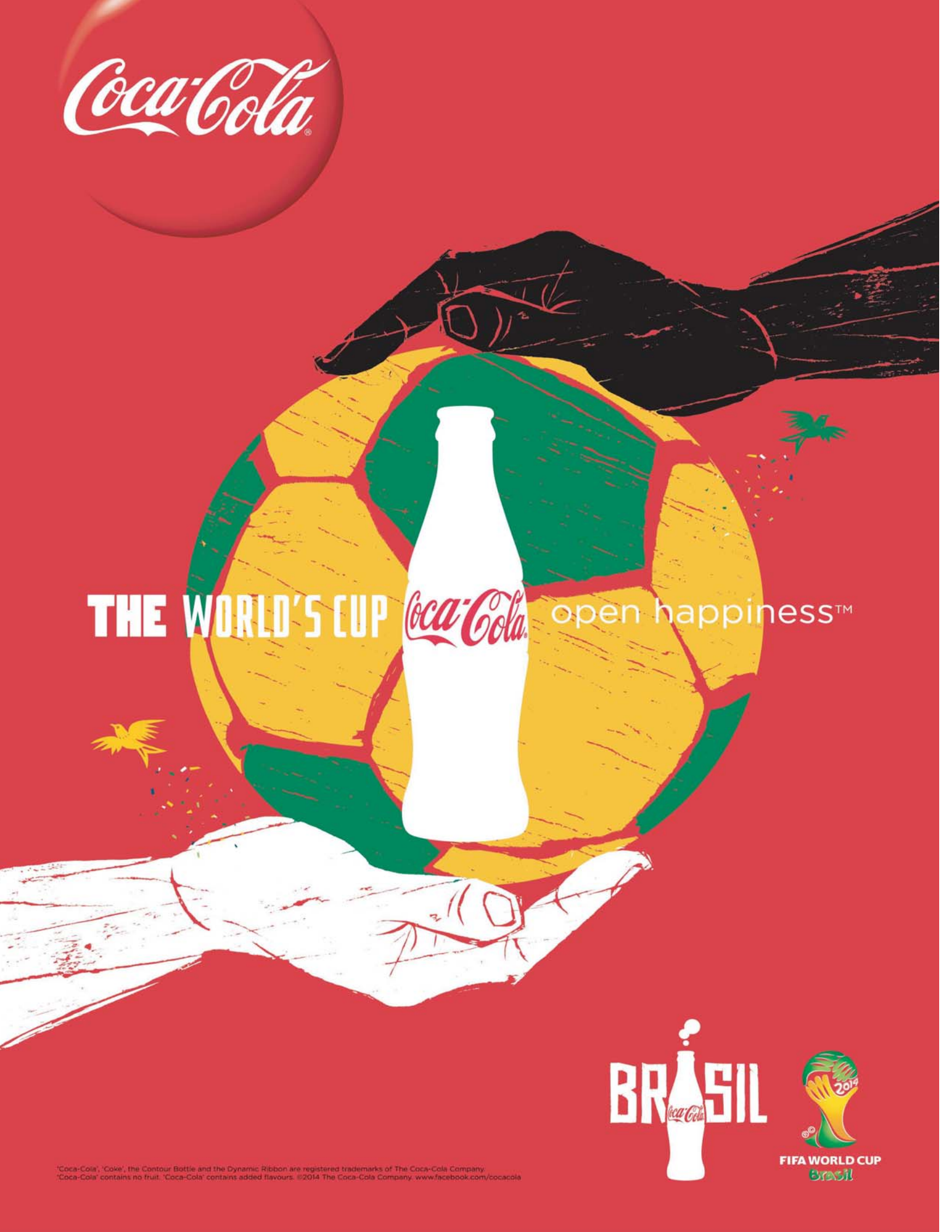

'Coca-Cola', 'Coke', the Contour Bottle and the Dynamic Ribbon are registered trademarks of The Coca-Cola Company.
'Coca-Cola' contains no fruit. 'Coca-Cola' contains added flavours. ©2014 The Coca-Cola Company. www.facebook.com/cocacola

এক নজরে

কাজী নজরুল ইসলাম

সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

জন্ম	: ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ (২৫ মে ১৮৯৯)। মঙ্গলবার। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। পিতা: কাজী ফকির আহমদ, মাতা: জাহেদা খাতুন।
শিক্ষা	: গ্রামের মক্তবে পাঠাভ্যাস শুরু। পরে ভর্তি হন বর্ধমানের মাথরুন হাই স্কুলে। তারপর ভর্তি হন ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুর স্কুলে। সবশেষে ভর্তি হন শিয়ারশোল রাজ হাই স্কুলে। কিন্তু দারিদ্র্য ও নানামাত্রিক পারিবারিক কারণে স্কুলের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেননি।
পল্টনে যোগদান	: ১৯১৭ সাল।
সাহিত্যকর্ম	: ১০ বছর বয়সে কবিতা রচনার সূত্রপাত। ২০ বছর বয়সে প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়, একটি গল্প। কাব্য ও সঙ্গীত মিলিয়ে মোট ৩৬টি গ্রন্থ। প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অগ্নি-বীণা* প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ: *দোলন-চাঁপা* (১৯২৩), *বিষের বাঁশী* (১৯২৪), *ভাঙার গান* (১৯২৪), *ছায়ানট* (১৯২৪), *চিত্তনামা* (১৯২৫), *সাম্যবাদী* (১৯২৫), *পুবের হাওয়া* (১৯২৫), *সর্বহারা* (১৯২৬), *ঝিঙে ফুল* (১৯২৬), *ফণি-মনসা* (১৯২৭), *সিন্ধু-হিন্দোল* (১৯২৭), *জিঞ্জীর* (১৯২৮), *চক্রবাক* (১৯২৯), *সন্ধ্যা* (১৯২৯), *প্রলয়-শিখা* (১৯৩০), *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* (১৯৩০), *নতুন চাঁদ* (১৯৩৩), *রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম* (১৯৩৪), *শেষ সওগাত* (১৯৩৮), So (১৯৪০), *কাব্য আমপারা* (১৯৪৩), *মরু ভাস্কর* (১৯৫৭), *নির্ঝর* (২০১৩)।
অনুবাদগ্রন্থ	: ৩টি। *রুবাইয়াৎ-ই হাফিজ*, *কাব্য আমপারা*, *রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম*।
ছোটগল্প	: প্রকাশিত মোট গল্প ১৮টি। ৩টি গল্পসংকলন: *ব্যথার দান* (১৯২২), *রিক্তের বেদন* (১৯২৫), *শিউলিমালা* (১৯৩১)।
উপন্যাস	: ৩টি। *বাঁধন-হারা* (১৯২৭), *মৃত্যুক্ষুধা* (১৯৩০), *কুহেলিকা* (১৯৩১)।

নাটক	: ৩টি । *ঝিলিমিলি* (১৯৩০), *আলেয়া* (১৯৩১), *মধুমালা* (১৯৫৯)।
শিশুসাহিত্য	: ৬টি কবিতার বই ও একটি নাটক।
প্রবন্ধগ্রন্থ	: ৫টি। *যুগবাণী* (১৯২২), *রাজবন্দীর জবানবন্দী* (১৯২৩), *রুদ্রমঙ্গল* (১৯২৬), *দুর্দিনের যাত্রী* (১৯২৬), *ধূমকেতু* (১৯২৭)।
শেষ গ্রন্থ	: অসুস্থ হওয়ার পূর্বে কবিতা ও গানের সংকলন *নির্ঝর* (২০১৩)। মৃত্যুর পরে বিভিন্ন সাময়িকীপ ত্রাদিতে প্রকাশিত রচনা নিয়ে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।
গানের সংখ্যা	: তিন হাজারেরও অধিক গান।
কবিতার সংখ্যা	: প্রায় ৮০০।
প্রবন্ধ/আলোচনা	: প্রায় ১০০।
য়েরচনার জন ্য কারাবরণ	: 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা।
ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক	
বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ	: ৭টি। *যুগবাণী, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, দুর্দিনের যাত্রী, রুদ্রমঙ্গল, প্রলয়-শিখা, চন্দ্রবিন্দু*।
পত্রিকা সম্পাদনা	: ৩টি। সান্ধ্য দৈনিক *নবযুগ* (১৯২০), *ধূমকেতু* (১৯২২), *লাঙল* (১৯২৫)।
সাহিত্যচর্চার কাল	: ২৩ বছর। ১৯১৯ থেকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ।
সম্মাননা	: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত *জগত্তারিণী* পুরস্কার (১৯৪৫), ভারত সরকার প্রদত্ত *পদ্মভূষণ* উপাধি (১৯৬০), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত *ডি লিট* উপাধি (১৯৬৯), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত *ডি লিট* উপাধি (১৯৭৩), বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত *একুশে পদক* (১৯৭৫)। বাংলাদেশের রণসঙ্গীতের ('চল চল চল...') রচয়িতা।
চলচ্চিত্রে অভিনয়	: *ধ্রুব* চলচ্চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয়।
চলচ্চিত্রে সঙ্গীতপরিচালনা	: বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রের সঙ্গীতপরিচালক। উ লেস্নখযোগ্য চলচ্চিত্র: গিরিশচন্দ্র ঘোষের *ধ্রুব*, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের *পাতাল-পুরী*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গোরা*।
চলচ্চিত্রের কাহিনি ও	
সংলাপ রচনা	: *বিদ্যাপতি* (১৯৩৮)। পরিচালক: দেবকীকুমার বসু। *সাপুড়ে* (১৯৩৯)। পরিচালক: দেবকীকুমার বসু।
রেডিওনাট ্য	: ৭টি।
মৃত্যু	: ১২ ভাদ্র ১৩৮৩ (২৯ আগস্ট ১৯৭৬), রবিবার। ঢাকার পি জি হাসপাতালে (বর্তমান নাম: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়), ৭৭ বছর ৩ মাস বয়সে। অসুস্থতার শুরু: ১৯৪২ সালের ৯ জুলাই।

প্রবন্ধ

বিদ্রোহী কবি: বিদ্রোহী কবিতা

সৈয়দ শামসুল হক

কবিতা-পাঠক বা কবিতা-অনুরাগীরা তো বটেই, বাংলা কবিতার সঙ্গে দূরতম পরিচয় যাঁদের আছে তাঁরা কাজী নজরুল ইসলামের *বিদ্রোহী* কবিতাটির কথা জানেন এবং অনেকেই স্মরণ-উদ্ধৃত করতে পারবেন এ কবিতার অন্তত প্রথম কতিপয় পঙ্‌ক্তি–

বল বীর
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!

এবং এটাও অনেকের মনে পড়বে, ১৯২২ সালের শুরুতেই *বিদ্রোহী* প্রকাশিত হবার পরপর– কিংবা বর্তমানের মৌলবাদী কালেও– এ কবিতার অষ্টম ও নবম পঙ্‌ক্তি মুসলমান অনেকেরই কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি, অধিক কি নজরুলের খোদাদ্রোহিতা বলে ধরা হয়, যেখানে তিনি বলছেন–

খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাতৃর!

এবং এ কবিতায় হিন্দুপুরাণ থেকে বন্যাস্রোতের মত যে প্রতীকসমূহ উঠে আসে, সেটাও নজরুলের অনুকূলে তৎকালে যায় না কিন্তু কবিতাটির এহেন সংকীর্ণ পাঠ অচিরেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে, বস্তুত চাপাই পড়ে যায়– অগ্নিগিরিতুল্য এ কবিতার শব্দধ্বনিবাহিত অন্তর-সত্যের উদ্গীরণে। সেই সত্যের প্রকাশটি স্পষ্টই আমরা প্রত্যক্ষ করে উঠি *বিদ্রোহী*র প্রায় অন্তিম এই পঙ্‌ক্তিকতিপয়ে:

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না–
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত!

আর, এখানেই কবিতাটি হয়ে ওঠে একজন কবির সেই অমোঘ উচ্চারণ, সেই যশোসিদ্ধি পায় তাঁর এ কবিতা, যার জন্যে তাঁর ভাষাভাষী মানুষেরা– সেদিনের ব্রিটিশ শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষেরা এমন কি আজকের দিনেও শোষিত বঞ্চিত নির্যাতিত যে-যেখানে যারা তাঁকে স্থাপন করে কবিতা-স্বর্গে অমরগণের সারিতে।

বিদ্রোহী লেখা হয়েছিল ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ কোন এক রাতে; শুনেছি, ভূতগ্রস্তের মত–

আমরা একে সাধারণ কথায় বলব কবিতায়-পাওয়া নজরুল সেই রাত্রিঘন আলোআঁধারিতে একটানা লিখে উঠেছিলেন এর ১৪৭টি পঙ্‌ক্তি– শুনেছি, কাঠ পেনসিলে তিনি আলগা কাগজে কবিতাটি লিখে উঠেছিলেন এবং তখন যে তিনি একই ঘরে বাস করতেন কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে, তাঁকেই তিনি জাগিয়ে তুলে কবিতাটি প্রথম শোনান।

বিদ্রোহী প্রথম ছাপা হয় সাপ্তাহিক *বিজলী* পত্রিকায়; ছাপার পরেপরেই এর যে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মত, *বিজলী*র দ্বিতীয় মুদ্রণ করতে হয়; মুজাফ্‌ফর আহমদের কথায় দু'বারে *বিজলী* মোট উনত্রিশ হাজার কপি ছাপতে হয়েছিল পাঠক-চাহিদা মেটাবার জন্যে। পাঠক তারপরও তৃষিত হয়ে থাকে কবিতাটি পড়বার জন্যে; পরেপরেই *বিদ্রোহী* ফের ছাপা হয় *মোসলেম ভারত* পত্রে; কিন্তু এখানেই শেষ নয় এর প্রকাশনা ইতিহাস– পুনর্মুদ্রিত হয়, হতে থাকে, *প্রবাসী*, *সাধনা*, *ধূমকেতু* ও *দৈনিক বসুমতি*তে। বাংলাভাষার যে কোন কবিতা প্রকাশের ক্ষেত্রে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা– আগে তো ছিলই না, পরেও আর এ অবধি দেখা যায় না।

বস্তুত *বিদ্রোহী* নামাঙ্কিত এ কবিতটি হয়ে ওঠে নজরুলেরই কাব্যমূর্তির প্রতীক, চিরকালের মত তিনি চিহ্নিত হয়ে যান বিদ্রোহী রূপে, অতঃপর তাঁর জন্যে আমাদের অনিবার্য নাম-বিশেষণই হয়ে ওঠে বিদ্রোহী– যেমন, খুব গভীরে না-অনুভব করেও আমরা বলি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, তেমনি– অনেকটাই না-বুঝে আমরা তাঁর নাম এমত উচ্চারণ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। শুধু বাংলাভাষায় কেন, পৃথিবীর আর কোন ভাষার আর কোন কবির ক্ষেত্রে তাঁর একটি কবিতার সঙ্গে নিজনাম এমন অমোচ্য লেপিত হয়ে গেছে বলে আমার জানা নেই।

নাট্যকার ইব্রাহিম খাঁকে নজরুল এক চিঠি লেখেন– *বিদ্রোহী* কবিতা রচনার বছরপাঁচেক পরে– যখন এ কবিতা সকল সমালোচনা ও তর্কবিতর্কের ঊর্ধ্বে বাঙালির ভাবসম্পদের চিরকালীন একটা অংশ হয়ে গেছে– নজরুল তখন লিখছেন–

'বিদ্রোহীর জয়-তিলক আমার ললাটে অক্ষয় হয়ে গেল আমার তরুণ বন্ধুদের ভালোবাসায়।... আমি বিদ্রোহ করেছি– বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে– যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন-পচা সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভ-মী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।... গড়ে তুলতে হলে একটা শৃঙ্খলার দরকার; কিন্তু ভাঙার কোন শৃংখল বা সাবধানতার প্রয়োজন আছে মনে করিনে। নতুন করে গড়তে চাই বলেই ত ভাঙি– আঘাতের পর আঘাত হেনে পচা-পুরাতনকে পাতিত করি।'

আর, এখানেই আমরা বিদ্রোহী কবিতাটিকে বুঝবার চাবি পেয়ে যাব; আমরা নজরুলের এই কথাগুলো মনে রাখলে দেখতে পাব, কবিতাটির ভেতরে যে বক্তব্যের আপাতবিরোধিতা অনেকে লক্ষ্য করেছেন, বলেছেন– এ উন্মাদের প্রলাপমাত্র!– তা এসেছে ওই ভাঙার প্রবণতা থেকেই, একে বুঝতে হবে ওই আলোটিতেই এবং ভাঙতে ভাঙতে, কেবল বক্তব্যে নয়, বক্তব্যের জন্যে ছন্দকেও ভাঙতে ভাঙতে, প্রথাসিদ্ধ ছয়মাত্রার চলনকে দুমড়ে মুচড়ে নিজের করে তুলতে তুলতে, তিনি কবিতার অন্তিমে পৌঁছুচ্ছেন শান্ত, সান্তপ্রায়, সিদ্ধির চরমে আগত এক ধীরতায়– যখন আর শুরুর উন্মাদনা নেই, যখন তিনি অনুভব করছেন তাঁর বিদ্রোহ-কর্তব্য শেষে রণক্লান্তির সুষমা, তখন শুরুর তুমুল আলোড়ন ও তীব্রতার পঙ্‌ক্তিগুলো প্রায় পুনরাবৃত্ত হচ্ছে, বস্তুত বিরাম পাচ্ছে, এই ধীরোদত্ত স্বরে–

আমি চির-বিদ্রোহী বীর
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির।

লক্ষ্য করতে বলব ওই 'একা' শব্দটির দিকে এবং আমাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হবে কবিতাটির আর কোথাও নয়, একেবারে শেষে এসে এই শব্দটির ব্যবহার দেখে। কিন্তু গভীর মূলে এই একাকীত্ব যে কতখানি সত্য তা আমরা উপলব্ধি করতে পারব যদি আমরা মহাত্মা গান্ধী বা শেখ মুজিবুরের জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখি– দেখব শেষ পর্যন্ত নির্মাণের কোঠায় পৌঁছে কিভাবে একা হয়ে যান একজন কবি বা বিদ্রোহী, মানুষের মানস-নির্মাতা একজন, তথা ইতিহাসরচয়িতাই স্বয়ং।

সৈয়দ শামসুল হক কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক
ভারত বিচিত্রা মে ২০১২ সংখ্যায় প্রকাশিত

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

ভারতে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রদের প্রতি আবেদন

*ভারত বিচিত্রা*র পক্ষ থেকে ভারতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি (Association of Bangladesh Students Studied in India- ABSSI)-র সদস্যসহ ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাংলাদেশী প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য রচনা ও মতামত পাঠানোর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এখন থেকে *ভারত বিচিত্রা*র এক পৃষ্ঠায় এইসব লেখা নিয়মিতভাবে ছাপা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে *ভারত বিচিত্রা* আইসিসিআর-বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রসহ ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ রচনা করতে আগ্রহী যাতে এবিএসএসআই-এর কর্মকা- এবং ভারতে তাঁদের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ জনসমক্ষে প্রচারিত হয়। এভাবে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিদ্যমান উষ্ণ সম্পর্কে তাঁরা আরো গতিবেগ সঞ্চার করতে পারবেন বলে আমাদের ধারণা।

মাসের প্রথম সপ্তাহে *ভারত বিচিত্রা*র ঠিকানায় প্রাপ্ত লেখা পরবর্তী মাসে ছাপার জন্য বিবেচিত হবে।

বিদ্রোহী

কাজী নজরুল ইসলাম

বল বীর–
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি' আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর–
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোকে দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতৃর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর
বল বীর–
আমি চির-উন্নত শির!

আমি চিরদুর্দম দুর্বিনীত, নৃশংস
মহা- প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস!
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর,
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
আমি মানি না কো কোনো আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন!
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল–বৈশাখীর
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ববিধাতৃর!
বল বীর–
চির-উন্নত মম শির!
আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সমুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি'।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ।
আমি হাম্বার, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চল-চঞ্চল, ঠমকি' ছমকি'
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'
ফিং দিয়া দিই তিন দোল্:
আমি চপলা-চপল হিন্দোল।
আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা',
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!
আমি মহামারী আমি ভীতি এ ধরিত্রীর;
আমি শাসন-ত্রাসন, সংহার আমি উষ্ণ চির-অধীর।
বল বীর–
আমি চির-উন্নত শির!

আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম্ ভরপুর্ মদ।
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান।
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য;
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির।
বল বীর–
চির- উন্নত মম শির!

আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ স্নান গৈরিক।
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ!
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দ-,
আমি চক্র ও মহা শঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড!
আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব।
আমি প্রাণ-খোলা হাসি উল্লাস, –আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস
আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস!
আমি কভু প্রশান্ত, –কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী!
আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকলোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল ছল-ছল, চল-ঊর্মির হিন্দোল-দোল!–

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণু, তন্বী-নয়নে বহ্নি
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যি!
আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ আমি

হুতাশীর।
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয় লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের
আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিত চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম প্রকাশ কুমারীর!
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-করে-দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তা'র কাঁকন-চুড়ির কন্-কন্।
আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর!
আমি উত্তর-বায়ু মলয়-অনিল উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি
আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি!
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি, এ কি উন্মাদ আমি উন্মাদ!
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাধ!

আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন।
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ মর্ত্য-করতলে,
তাজী বোর্‌রাক্ আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মত-হ্রেষা হেঁকে চলে!

আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল!
আমি তড়িতে চড়িয়া উঠে চলি জোর তুড়ি দিয়া দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চারী' ভূমিকম্প।
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি'–
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি'।

আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল!
আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,
মহা-সিন্ধুর উতলা ঘুম্‌ঘুম্
ঘুম চুমু দিয়ে করি নিখিল বিশ্ব নিঝ্‌ঝুম
মম বাঁশরীর তানে পাশরি'।
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।
আমি রুষে উঠি' যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!
আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া!

আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা–
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!
আমি অন্যায়, আমি আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণী!
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!

আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়।
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,
জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মাথিয়া ফিরি স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্য!
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাধ!!

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে
মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না–
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না–
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!

আমি চির-বিদ্রোহী বীর
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!

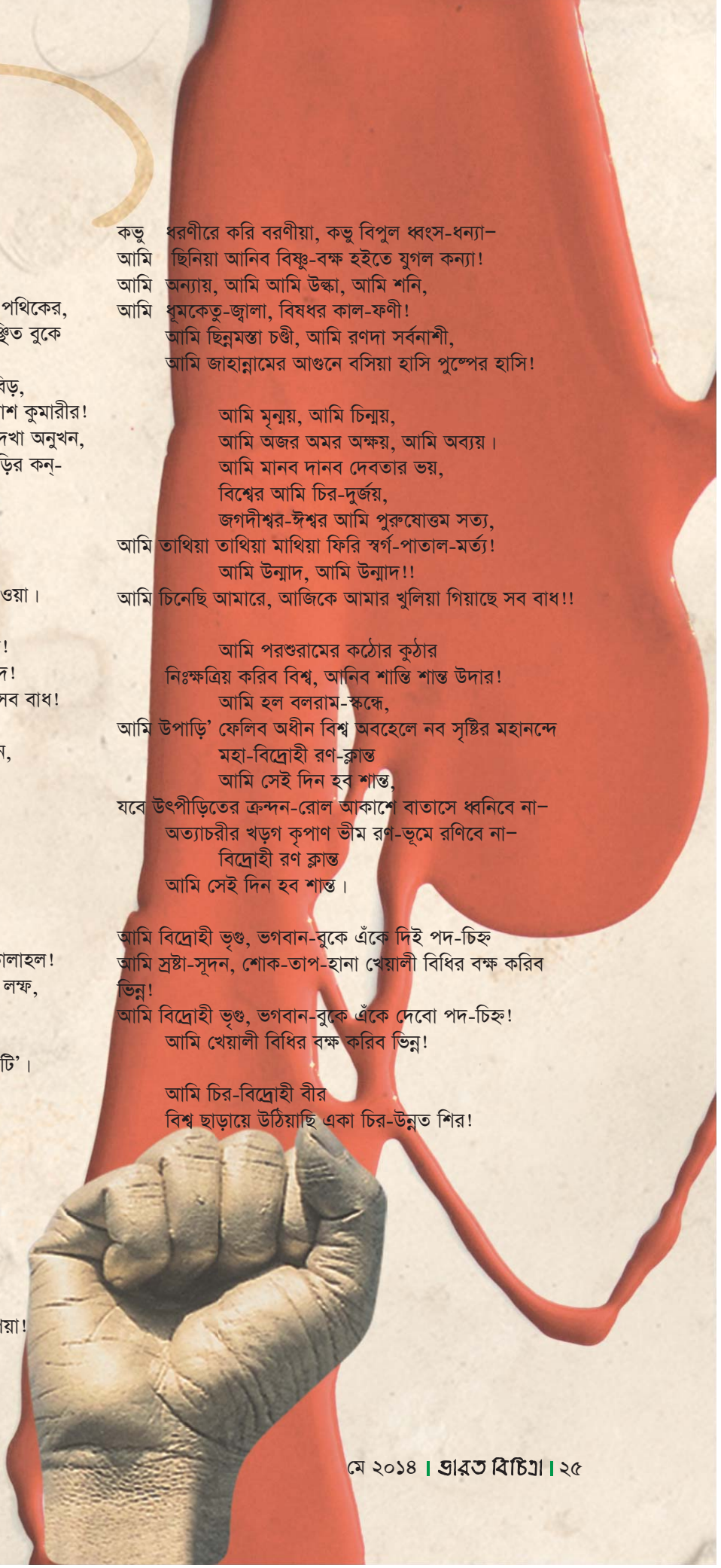

ছোটগল্প

পদ্ম-গোখ্‌রো

কাজী নজরুল ইসলাম

রসুলপুরের মীর সাহেবদের অবস্থা দেখিতে দেখিতে ফুলিয়া ফাঁপাইয়া উঠিল। লোকে কানাঘুষা করিতে লাগিল, তাহারা জীনের বা যক্ষের ধন পাইয়াছে। নতুবা এই দুই বছরের মধ্যে আলাদীনের প্রদীপ ব্যতীত কেহ এরূপ বিত্ত সঞ্চয় করিতে পারে না।

দশ বৎসর পূর্বেও মীর সাহেবদের অবস্থা দেশের কোন জমিদারের অপেক্ষা হীন ছিল না সত্য, কিন্তু সে জমিদারি কয়েক বৎসরের মধ্যেই 'ছিল ঢেঁকি হল তুল, কাটতে কাটতে নির্মূল' অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল।

মুর্শিদাবাদের নওয়াবের সহিত টেক্কা দিয়া বিলাসিতা করিতে গিয়াই নাকি তাঁহাদের এই দুরবস্থার সূত্রপাত।

লোকে বলে, তাঁহারা খড়মে পর্যন্ত সোনার ঘুঙুর লাগাইতেন। বর্তমান মীর সাহেবের পিতামহ নাকি স্নানের পূর্বে তেল মাখাইয়া দিবার জন্য এক গ্রোস যুবতী সুন্দরী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর সাথে সাথে স্বর্ণ-লঙ্কা দগ্ধ-লঙ্কায় পরিণত হইল। এমন কি তাঁহার পুত্রকে গ্রামেই একটি ক্ষুদ্র মক্তব চালাইয়া অর্ধ-অনশনে দিনাতিপাত করিতে হইয়াছে।

এমন পিতামহের পৌত্রের নিশ্চয়ই কোন খান্দানী জমিদার বংশে বিবাহ হইল না। কিন্তু যে বাড়ির মেয়ের সহিত বিবাহ হইল, সে বাড়ির বংশ-মর্যাদা মীর সাহেবদের অপেক্ষা কম ত নয়ই, বরং অনেক বেশি।

বিলাসী মীর সাহেবের পৌত্রের নাম আরিফ। বধূর নাম জোহরা। জোহরার রূপের খ্যাতি চারিপাশের গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল! কিন্তু অত রূপ, অমন বংশ-মর্যাদা সত্ত্বেও দরিদ্র সৈয়দ

জোহরার মাথায় কি খেয়াল চাপিল, সে তাড়াতাড়ি এক বাটি দুধ আনিয়া নির্ভয়ে কলসির একটু দূরে রাখিতেই সাপটা কলসি ত্যাগ করিয়া শান্তভাবে দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। জোহরা সেই অবসরে পিতলের কলসি তুলিয়া লইল। সাপটা অনায়াসে তাহার হাতে ছোবল মারিতে পারিত, কিন্তু সে কিছু করিল না। এক মনে দুগ্ধ পান করিতে করিতে ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত এক প্রকার শব্দ করিতে লাগিল।

সাহেবের কন্যাকে গ্রহণ করিতে কোন নওয়াবপুত্রের কোন উৎসাহই দেখা গেল না।

মেয়ে গোঁজে বাঁধা থাকিয়া বুড়ি হইবে– ইহাও পিতামাতা সহ্য করিতে পারিলেন না। কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বর্তমানে দরিদ্র মক্তবশি ক্ষক মীর সাহেবের পুত্র আরিফের হাতেই তাহাকে সমর্পণ করিয়া বাঁচিলেন।

মীর সাহেবদের আর সমস্ত ঐশ্বর্য উঠিয়া গেলেও রূপের ঐশ্বর্য আজও এতটুকু ম্লান হয় নাই এবং এ রূপের জ্যোতি কুতুবপুরের সৈয়দ সাহেবদের রূপখ্যাতিকেও লজ্জা দিয়া আসিয়াছে।

কাজেই আরিফ ও জোহরা যখন বরবধূ বেশে পাশাপাশি দাঁড়াইল, তখন সকলেরই চক্ষু জুড়াইয়া গেল। যেন চাঁদে চাঁদে প্রতিযোগিতা।

পিতার মন খুঁত খুঁত করিলেও জোহরার মাতার মন জামাতা ও কন্যার আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া গভীর প্রশান্তিতে পুরিয়া উঠিল।

আনন্দে প্রেমে আবেশে শুভদৃষ্টির সময় উভয়ের ডাগর চক্ষু ডাগরতর হইল।

আরিফের মাতা কিছুদিন হইতে চিররুগ্ণা হইয়া শয্যাশায়িনী ছিলেন। বধূমাতা আসিবার পর হইতেই তিনি সারিয়া উঠিতে লাগিলেন। আনন্দে গদগদ হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, 'বৌমার পয়েই আমি সেরে উঠলাম, আমার ঘর আবার সোনাদানায় ভরে উঠবে।'

গ্রামময় এই কথা পলবিত হইয়া প্রচার হইয়া পড়িল যে, মীর সাহেবদের সৌভাগ্যলক্ষ্মী আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

মানুষের 'পয়' বলিয়া কোন জিনিস আছে কিনা জানি না, কিন্তু জোহরার মীরবাড়ি তে পদার্পণের পর হইতেই মীর সাহেবদের অবস্থা অভাবনীয়রূপে ভাল হইতে অধিকতর ভালর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

গ্রামে প্রথমে রাষ্ট্র হইল, মীর সাহেবদের নববধূ আসিয়াই তাহাদের পূর্বপুরুষদের প্রোথিত ধনরত্নের সন্ধান করিয়া উদ্ধার করিয়াছে, তাহাতেই মীরবাড়ির এই অপূর্ব পরিবর্তন।

গুজবটা একেবারে মিথ্যা নয়। জোহরা একদিন তাহার শ্বশুরালয়ের জীর্ণ প্রাসাদের একটা দেয়ালে একটা অস্বাভাবিক ফাটল দেখিয়া কৌতূহলবশেই সেটা পরীক্ষা করিতেছিল। হয়তো বা তাহার মন গুপ্ত ধনরত্নের সন্ধানী হইয়াই এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিল। তাহার কী মনে হইল, সে একটা লাঠি দিয়া সেই ফাটলে খোঁচা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে ক্রুদ্ধ সর্পের গর্জনের মত একটা শব্দ আসিতে সে ভয়ে পলাইয়া আসিয়া স্বামীকে খবর দিল।

বলাবাহুল্য, আরিফ নববধূকে অতিরিক্ত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। শুধু আরিফ নয়, শ্বশুরশাশুড়ি পর্যন্ত জোহরাকে অত্যন্ত সুনজরে দেখিয়াছিলেন।

জোহরার এই হঠকারিতায় আরিফ তাহাকে প্রথমে বকিল, তাহার পর সেইখানে গিয়া দেখিল সত্য সত্যই ফাটলের ভিতর হইতে সর্প-গর্জন শ্রুত হইতেছে। সে তাহার পিতাকে বাহির হইতে ডাকিয়া আনিল।

পুত্র অপেক্ষা পিতা একটু বেশি দুঃসাহসী ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'ও সাপটাকে মারিতেই হইবে, নৈলে কখন বেরিয়ে কাউকে কামড়িয়ে বসবে। ওর গর্জন শুনে মনে হচ্ছে, ও নিশ্চয়ই জাত সাপ।' বলিয়া বধূমাতাকে মৃদু তিরস্কার করিলেন।

স্থানটা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অতি সন্তর্পণে তাহার খানিকটা পরিষ্কার করিয়া বার কতক খোঁচা দিতেই একটা বৃহৎ দুগ্ধধবল গোখ্‌রো সাপ বাহির হইয়া আসিল, মস্তকে তাহার সিঁদুরবর্ণ চক্র বা খড়মের চিহ্ন। আরিফ সাপটাকে মারিতে উদ্যত হইতেই পিতা বলিয়া উঠিলেন, 'মারিস নে মারিস নে, ও বাস্তু সাপ। দেখছিস নে, ও যে পদ্ম-গোখ্‌রো।'

আরিফের উদ্যত যষ্টি হাতেই রহিয়া গেল। জঙ্গলের মধ্যে পদ্ম-গোখ্‌রোরূপী বাস্তু সাপ অদৃশ্য হইয়া গেল।

সকলে চলিয়া আসিতেছিল। জোহরা আরিফকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, 'তোমরা যখন সাপটাকে খোঁচাচ্ছিলে তখন কেমন এক রকম শব্দ হচ্ছিল। ওখানে নিশ্চয়ই কাঁসা বা পিতলের কোন কিছু আছে।' আরিফের চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আসিয়া তাহার পিতাকে বলিতে তিনি প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, 'কই রে, সে রকম কোন শব্দ তো শুনিনি।'

আরিফ বলিল, 'আমরা তো সাপের ভয়েই অস্থির, কাজেই শব্দটা হয়তো শুনতে পাইনি।'

পিতাপুত্রে সন্তর্পণে দেয়ালের দুই চারটি ইট সরাতেই দেখিতে পাইলেন, সত্যই ভিতরে কি চক্‌চক্ করিতেছে।

পিতাপুত্রে তখন পরম উৎসাহে ঘণ্টা দুই পরিশ্রমের পর যাহা উদ্ধার করিলেন তাহাকে যক্ষের ধন বলা চলে না, কিন্তু তাহা সামান্যও নয়। বিশেষ করিয়া তাহাদের বর্তমান অবস্থায়।

একটি নাতিবৃহৎ পিতলের কলসি বাদশাহী আশরফীতে পূর্ণ কিন্তু এই কলসি উদ্ধার করিতে তাহাদের জীবন প্রায় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

কলসি উদ্ধার করিতে গিয়া আরিফ দেখিল, সেই কলসির কণ্ঠ জড়াইয়া আর একটা পদ্ম-গোখ্‌রো। আরিফ ভয়ে দশ হাত পিছাইয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওরে বাপরে! সাপটা আবার এসেছে ঐখানে।'

জোহরা অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, 'না, ওটা আর একটা। ওটারই জোড়া হবে বোধ হয়। প্রথমটা ওই দিকে চলে গেছে, আমি দেখছি।'

কিন্তু এ সাপটা প্রথমই হোক বা অন্য একটা হোক, কিছুতেই কলসি ছাড়িয়া যাইতে চায় না। অথচ পদ্ম-গোখ্‌রো মারিতেও নাই।

কলসির কণ্ঠ জড়াইয়া থাকিয়াই পদ্ম-গোখ্‌রো তখন মাঝে মাঝে ফণা বিস্তার করিয়া ভয় প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

জোহরার মাথায় কি খেয়াল চাপিল, সে তাড়াতাড়ি এক বাটি দুধ আনিয়া নির্ভয়ে কলসির একটু দূরে রাখিতেই সাপটা কলসি ত্যাগ করিয়া শান্তভাবে দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। জোহরা সেই অবসরে পিতলের কলসি তুলিয়া লইল। সাপটা অনায়াসে তাহার হাতে ছোবল মারিতে পারিত, কিন্তু সে কিছু করিল না। এক মনে দুগ্ধ পান করিতে করিতে ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত এক প্রকার শব্দ করিতে লাগিল। একটু পরেই আর একটা পদ্ম-গোখ্‌রো আসিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে লাগিল।

জোহরা বলিয়া উঠিল, 'ওই আগের সাপটা! এখনো গায়ে খোঁচার দাগ রয়েছে। আহা, দেখেছ কী রকম নীল হয়ে গেছে।'

আরিফ ও তাহার পিতামাতা অবাক বিস্ময়ে জোহরার কীর্তি দেখিতেছিলেন। ভয়েবিস্ময়ে তাহাদেরও মনে ছিল না যে, তাহাকে এখনি সাপে কামড়াইতে পারে! এইবার তাহারা জোর করিয়া জোহরাকে টানিয়া সরাইয়া আনিলেন।

কলসিতে সোনার মোহর দেখিয়া আনন্দে তাহারা জোহরাকে লইয়া যে কী করিবেন, কোথায় রাখিবেন– ভাবিয়া পাইলেন না।

শ্বশুরশাশুড়ি অশ্রুসিক্ত চোখে বারে বারে বলিতে লাগিলেন, 'সত্যিই মা, তোর সাথে মীরবাড়ির লক্ষ্মী আবার ফিরে এল!'

কিন্তু এই সংবাদ এই চারিটি প্রাণী ছাড়া গ্রামের আর কেহ জানিতে পারিল না। সেই মোহর গোপনে কলিকাতায় গলাইয়া বিক্রয় করিয়া যে

আরিফ বধূকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া ব্যবসা দেখিতে কলিকাতা চলিয়া গেল। জোহরার পিতা-মাতা কন্যার নিরাভরণ রূপই দেখিয়া আসিয়াছেন, আজ সে যখন সালঙ্কারা বেশে স্বর্ণ-কান্তি স্বর্ণ-ভূষণে ঢাকিয়া গৃহে পদার্পণ করিল, দরিদ্র পিতা-মাতা তখন যেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কন্যা-জামাতাকে যে কোথায় রাখিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। দু'একদিন যাইতে না যাইতে পিতা-মাতা দেখিলেন, কন্যার মুখের হাসি শুকাইয়া গিয়াছে।

অর্থ পাওয়া গেল, তাহাতে বর্তমান ক্ষুদ্র মীর পরিবারে সহজ জীবনযাপন স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিত। কিন্তু বধূর 'পয়' দেখিয়াই বোধ হয়– আরিফ তাহারই কিছু টাকা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল। ব্যবসায় আশার অতিরিক্ত লাভ হইতে লাগিল।

বছর দুয়েকের মধ্যে মীরবাড়ির পুরাতন প্রাসাদের পরিপূর্ণ রূপে সংস্কার হইল। বাড়ি ঘর আবার চাকরদাসী তে ভরিয়া উঠিল।

পরে কর্পোরেশনের কন্ট্রাক্টরি হস্তগত করিয়া আরিফ বিপুল অর্থ উপার্জন করিতে লাগিল।

কোন কিছুরই অভাব থাকিল না, কিন্তু জোহরাকে লইয়া তাহারা অত্যন্ত বিপদে পড়িল।

দুই.

এই অর্থপ্রাপ্তির পর হইতেই জোহরা যেমন পদ্ম-গোখ্‌রো-যুগলের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহপ্রবণ হইয়া উঠিল, সাপ দুইটিও জোহরার তেমনি অনুরাগী হইয়া পড়িল। অথবা হয়তো দুধ-কলার লোভেই তাহারা জোহরার পিছু পিছু ফিরিতে লাগিল।

জোহরার শ্বশুরশা শুড়ি-স্বামী সাপের ভয়ে যেন প্রাণ হাতে করিয়া সর্বদা মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। বাস্তু সর্প– মারিতেও পারেন না, পাছে আবার এই দৈব অর্জিত অর্থ সহসা উবিয়া যায়।

অবশ্য সর্পযুগল যেরূপ শান্ত ধীরভাবে বাড়ির সর্বত্র চলাফেরা করিতে লাগিল, তাহাতে ভয়ের কিছু ছিল না। তবু জাত সাপ তো! একবার ক্রুদ্ধ হইয়া ছোবল মারিলেই মৃত্যু যে অবধারিত।

পিতৃপিতাম হের ভিটা ত্যাগ করিয়া যাওয়াও এক প্রকার অসম্ভব। তাঁহারা কি যে করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

জোহরা হয়তো রান্না করিতেছে, হঠাৎ দেখা গেল সর্প-যুগল তাহার পায়ের কাছে আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শাশুড়ি দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন। বধু তাহাদের তিরস্কার করিতেই তাহারা আবার নিঃশব্দে সরিয়া যায়।

বধূ শাশুড়ি খাইতে বসিয়াছে, হঠাৎ বাস্তু সর্পদ্বয় আসিয়াই বধূর ডালের বাটিতে চুমুক দিল। দুগ্ধ নয় দেখিয়া ক্রুদ্ধ গর্জন করিয়া উঠিতেই বধূ আসিয়া অপেক্ষা করিতে বলিতেই তাহারা ফণা নামাইয়া শুইয়া পড়ে, বধূ দুগ্ধ আনিয়া দেয়, খাইয়া তাহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।

ভয়ে শাশুড়ির পেটের ভাত চাল হইয়া যায়।

ইহাও সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু সাপ দুইটি এইবার যে উৎপাত আরম্ভ করিল তাহাতে জোহরার স্বামী বাড়ি ছাড়িয়া কলকাতা পলাইয়া বাঁচিল।

গভীর রাত্রে কাহার হিম-স্পর্শে আরিফের ঘুম ভাঙিয়া যায়। উঠিয়া দেখে, তাহারই শয্যাপার্শ্বে পদ্ম-গোখ্‌রোদ্বয় তাহার বধূর বক্ষে আশ্রয় খুঁজিতেছে। সে চিৎকার করিয়া পলাইয়া আসিয়া বাহির বাটিতে শয়ন করে।

জোহরা তিরস্কার করিলে তাহারা ফিরিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরে ভীত সন্তানের মত তাহারা ফিরিয়া আসিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া লুটাইয়া যেন কি মিনতি জানায়।

জোহরার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে। আর তিরস্কার করিতে পারে না। বেদেনীদের মত নির্বিকার নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের আদর করে, পার্শ্বে ঘুমাইতে দেয়।

জোহরার বিবাহের এক বছরের মধ্যে তাহার দু'টি যমজ সন্তান হইয়াই আঁতুড়ে মারা যায়। জোহরার স্মৃতিপটে সেই শিশুদের ছবি জাগিয়া উঠে। তাহার ক্ষুধাতুর মাতৃচিত্ত মনে করে, তাহার সেই দুরন্ত শিশুযুগলই যেন অন্য রূপ ধরিয়া তাহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছে! তাহাদের মৃত্যুতে যে দংশনজ্বালা সহ্য করিয়া সে আজও বাঁচিয়া আছে, ইহারা যদি দংশনই করে তবুও তাহার অপেক্ষা ইহাদের দংশন-জ্বালা বুঝি তীব্র নয়। স্নেহবুভুক্ষু তরুণীমাতার সমস্ত হৃদয়-মন করুণায় স্নেহে আপ্লুত হইয়া উঠে, ভয় ডর কোথায় চলিয়া যায়, আবিষ্টের মত সে ঐ সর্পশিশুদের লইয়া আদর করে, ঘুম পাড়ায়, সস্নেহে তিরস্কার করে।

স্বামী অসহায় ক্রোধে ফুলিতে থাকে, কিন্তু কোন উপায়ও নাই! তাহার ও তাহার প্রাণের অধিক প্রিয় বধূর মধ্যে এই উদ্যতফণা ব্যবধান সে লঙ্ঘন করিতে পারে না। নিস্ফল আক্রোশ অন্তরে অন্তরে পুড়িয়া মরে।

পয়মন্ত বধূ– তাহার উপরে রাগও করিতে পারে না! রাগ করিয়াই বা করিবে কি, তাহার তো কোন অপরাধ নাই।

একদিন সে ক্রোধবশে বলিয়াছিল, 'জোহরা তোমাকে ছেড়ে চাই না এই ঐশ্বর্য! মেরে ফেলি ও দুটোকে! এরচেয়ে আমার দারিদ্র্য ঢের বেশি শান্তিময় ছিল।'

জোহরা দুই চক্ষুতে অশ্রুভরা আবেদন লইয়া নিষেধ করে। বলে, 'ওরা আমার ছেলে! ওরা তো কোন ক্ষতি করে না। কাউকে কামড়াতে জানে না তো ওরা!'

আরিফ ক্রুদ্ধ হইয়া বলে, 'তোমায় দংশন করে না ওরা, কিন্তু ওদের বিষের জ্বালায় আমি পুড়ে মলুম! আমার কি ক্ষতি যে ওরা করেছে, তা তুমি বুঝবে না। এরচেয়ে যদি ওরা সত্যি সত্যিই দংশন করত, তাও আমার পক্ষে এ ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে ঢের বেশি সুখের হত!'

জোহরা উত্তর দেয় না, নীরবে অশ্রু মোচন করে! ইহারা যে তাহারই মৃত খোকাদের অন্যরূপী আবির্ভাব বলিয়া সে মনে করে, তাহাও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, সংস্কারে বাধে।

পিতা, পুত্র ও মাতা শেষে স্থির করিলেন, জোহরাকে কিছুদিনের জন্য তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হোক। হয়তো সেখানে গিয়া সে ইহাদের ভুলিয়া যাইবে এবং সর্প-যুগলও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে।

একদিন প্রত্যুষে সহসা আরিফের পিতা জোহরাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মা বহুদিন বাপের বাড়ি যাওনি, তোমার বাবাকে দু'তিনবার ফিরিয়ে দিয়ে অন্যায় করেছি, আজ আরিফ নিয়ে যাবে, তুমি কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে এস।'

জোহরা সব বুঝিল, বুঝিয়াও প্রতিবাদ করিল না। নীরবে অশ্রু মোচন করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কিন্তু সাপ দুইটিকে কোথাও দেখিতে পাইল না।

আরিফ বধূকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া ব্যবসা দেখিতে কলিকাতা চলিয়া গেল।

জোহরার পিতামাতা কন্যার নিরাভরণ রূপই দেখিয়া আসিয়াছেন, আজ সে যখন সালঙ্কারা বেশে স্বর্ণকান্তি স্বর্ণ-ভূষণে ঢাকিয়া গৃহে পদার্পণ করিল, দরিদ্র পিতামাতা তখন যেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কন্যা-জামাতাকে যে কোথায় রাখিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

দু'একদিন যাইতে না যাইতে পিতামাতা দেখিলেন, কন্যার মুখের হাসি শুকাইয়া গিয়াছে। সে সর্বদা যেন কাহার চিন্তা করে। সকল কথায় কাজে তাহার অন্যমনস্কতা ধরা পড়ে।

মাতা একদিন কন্যাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, 'হাঁরে আরিফকে চিঠি লিখব আসতে?'

কন্যা লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিল, 'না মা, উনি তো শনিবারেই আসবেন!'

জামাই আসিল, তবু কন্যার চোখেমুখে পূর্বের মত সে দীপ্তি দেখা গেল না।

মাতা কন্যাকে বলিলেন, 'সত্যি বল তো জোহরা, তোর

কি জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।'

জোহরা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, 'না মা! উনি তো আগের মতই আমায় ভালবাসেন! বাড়িতে আমার দু'টি খোকাকে ফেলে এসেছি, তাই মন কেমন করে।'

জোহরার মাতা আরিফের এই হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তির রহস্য কিছু জানিতেন না। কন্যার যমজ সন্তান হইয়া মারা গিয়াছে এবং ঐ বাড়ির প্রথামত সেই সন্তান দু'টিকে বাড়িরই সম্মুখের মাঠে গোর দেওয়া হইয়াছে জানিতেন। মনে করিলেন, কন্যা তাহাদেরই স্মরণ করিয়া একথা বলিল। গোপনে অশ্রু মুছিয়া তিনি কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে ছয় মাস চলিয়া গেল। জোহরাকে লইয়া যাইবার কেহ কোন কথা বলে না। জোহরার পিতা-মাতা অপেক্ষাও জোহরা বেশি ক্রুদ্ধ হইল। কি তাহার অপরাধ খুঁজিয়া পাইল না। স্বামী প্রতি শনিবার আসে, কিন্তু অভিমান করিয়াই সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না।

মাতা কিন্তু থাকিতে পারিলেন না। একদিন জামাতাকে বলিলেন, 'বাবা! জোহরা তো একরকম খাওয়াদাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে! ওর কি কোন রোগ বেরামই হল, তাও তো বুঝতে পারছি নে– দিন দিন শুকিয়ে মেয়ে যে কাঠ হয়ে যাচ্ছে।'

আরিফের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। বিষাক্ত সাপকে যে মানুষ এমন করিয়া ভালবাসিতে পারে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে ভাবিতে লাগিল জোহরা কি উন্মাদিনী? হঠাৎ তাহার মনে হইল, জোহরার মাতামহ বিখ্যাত সর্পতত্ত্ববিদ ছিলেন। ইহার মাঝে হয়তো সেই সাধনাই পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে!

ইহার মধ্যে সে বহুবার রসুলপুর গিয়াছে, কিন্তু সাপ দু'টিকে জোহরা চলিয়া যাইবার পর দুই একদিন ছাড়া আর দেখিতে পায় নাই। কিন্তু সেই দুই এক দিনই তাহারা কি উৎপাতই না করিয়াছে! তাহা দেখিয়া বাড়ি কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় নাই যে, উহারা জোহরাকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছে!

উদ্যতফণা আশীবিষ! তবু সে কি তাহাদের কাতরতা মিনতি। একবার আরিফ– একবার তাহার পিতা– একবার তাহার মাতার পায়ে লুটাইয়া পড়িতে চায়, আর তাহারা প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলায়!

আরিফ একথা বধূর কাছে প্রকাশ করে নাই, জোহরাও অভিমানভরে তাহাদের কোন কথাই জিজ্ঞাসা করে নাই।

জামাতা কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য কোনরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন না দেখিয়া জোহরার পিতা একদিন আরিফকে বলিলেন, 'বাবা, জান তো আমরা কত গরীব! মেয়ে তো শয্যা নিয়েছে। দেশে যা দুর্দিন পড়েছে, তাতে আমরা খেতেই পাচ্ছিনে, মেয়ের চিকিৎসা তো দূরের কথা! মেয়েটা এখানে থেকে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে, তার চেয়ে তুমি কিছু দিনের জন্য ওকে কলকাতায় বা বাড়িতে নিয়ে যাও। তারপর ভাল হলে ওকে আবার রেখে যেয়ো!' বলিতে বলিতে চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

স্থির হইল, আগামীকল্য সে প্রথমে জোহরাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে, সেখানে ডাক্তার দেখাইয়া একটু সুস্থ হইলে তাহাকে রসুলপুরে লইয়া যাইবে।

তিন.

রাত্রে আরিফের কিসের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চক্ষু মেলিতেই দেখিল, তাহার শিয়রে একজন কে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়া এবং পার্শ্বের কামরায় আর একজন লোক বোধ হয় স্ত্রীলোক জোহরার বাক্স ভাঙ্গিয়া তাহার অলঙ্কার অপহরণ করিতেছে। ভয়ে সে মৃতবৎ পড়িয়া রহিল; তাহার চিৎকার করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত কে যেন অপহরণ করিয়া লইয়াছে!

কিন্তু ভয় পাইলেও তাহার মনে কেমন সন্দেহ হইল। স্ত্রীলোক ডাকাত! সে ঈষৎ চক্ষু খুলিয়া তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বাহিরে এমন ভান করিয়া পড়িয়া থাকিল, যেন সে অঘোরে ঘুমাইতেছে।

যে ঘরে সে ও জোহরা শয়ন করিয়াছিল তাহার পার্শ্বে আর একটি কামরা– স্বল্পায়তন। সেই কামরায় একটা স্টিলের ট্রাঙ্কে জোহরার গহনাপত্র থাকিত। প্রায় বিশ হাজার টাকার গহনা! জোহরা বহু অনুনয় করিয়া আরিফকে ঐ গহনাপত্র রসুলপুরে রাখিয়া আসিবার জন্য বহুবার বলিয়াছে, আরিফ সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। সে বলিত, 'তোমার কপালেই আজ আমাদের ঐ অর্থ অলঙ্কার, ও কয়টা টাকার অলঙ্কার যদি চুরি যায় যাক, তোমাকে তো চুরি করতে পারবে না। ও তোমার জিনিস তোমার কাছে থাক! আর তাছাড়া তোমার বাবা এ অঞ্চলের পীর, ওঁর ঘরে কেউ চুরি করতে সাহস করবে না!'

আরিফ নিজের চক্ষুকে নিজে বিশ্বাস করিতে পারিল না, যখন দেখিল, ঐ মেয়ে ডাকাত আর কেহ নয় সে তাহার শাশুড়ি– জোহরার মাতা।

দু'দিন আগের ঝড়ে ঘরের কতগুলো খড় উড়িয়া গিয়াছিল এবং সেই অবকাশপথে শুক্লা দ্বাদশীর চন্দ্রকিরণ ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। শাশুড়ি সমস্ত অলঙ্কারগুলি পোটলায় বাঁধিয়া চলিয়া আসিবার জন্য মুখ ফিরাইতেই তাহার মুখে চন্দ্রের কিরণ পড়িল এবং সেই আলোকে আরিফ যাহার মুখ দেখিল, তাহাকে সে মাতার অপেক্ষাও ভক্তি করে। তাহার মুখে-চোখেম নে অমাবস্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

এত কুৎসিত এ পৃথিবী!

সে আর উচ্চবাচ্য করিল না। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল। সে দেখিল তাহার শাশুড়ির পিছু পিছু তরবারিধারী ডাকাতও বাহির হইয়া গেল। তাহারা উঠানে আসিয়া নামিতেই সে উঠিয়া বাতায়নপ থে দেখিতে পাইল ঐ ডাকাতও আর কেউ নয়– তাহারই শ্বশুর।

আরিফ জানিত, কিছুদিন ধরিয়া তাহার শ্বশুরের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। দেশেও প্রায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। মাঝে মাঝে তাহার শ্বশুর ঘটিবাটি বাঁধা দিয়া অন্নের সংস্থান করিতেছিলেন, ইহারও সে আভাস পাইয়াছিল। ইহা বুঝিয়াই সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থ সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু তাহার শ্বশুর তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। জোহরার হাতে দিয়াও সে দেখিয়াছে, তাঁহারা জামাতার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লইতে নারাজ।

হীনস্বাস্থ্য জোহরা অঘোরে ঘুমাইতেছিল, আরিফ তাহাকে জাগাইল না। ভয়ে, ঘৃণায়, ক্রোধে তাহার আর ঘুম হইল না।

সকালের দিকে একটু ঘুমাইতেই কাহার ক্রন্দনে সে জাগিয়া উঠিল। তাহার শাশুড়ি তখন চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, চোরে তাহাদের সর্বনাশ করিয়াছে।

জোহরাও তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিয়া বিস্ময়ে বিমূঢ়তার মত চাহিয়া রহিল।

আরিফের আর সহ্য হইল না। দিনের আলোকের সাথে সাথে তাহার ভয়ও কাটিয়া গিয়াছিল।

সে বাহিরে আসিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, 'আর কাঁদবেন না মা, ও অলঙ্কার যে চুরি করেছে তা আমি জানি, আমি ইচ্ছা করলে এখুনি তাদের ধরিয়ে দিতে পারি।'

বলাবাহুল্য, এক মুহূর্তে শাশুড়ির ক্রন্দন থামিয়া গেল! শ্বশুরশা শুড়ি দুই জন পরস্পরে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল।

আরিফ বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার শ্বশুর জামাতার হাত ধরিয়া বলিল, 'কে বাবা সে চোর? দেখেছ?

দু'দিন আগের ঝড়ে ঘরের কতগুলো খড় উড়িয়া গিয়াছিল এবং সেই অবকাশপথে শুক্লা দ্বাদশীর চন্দ্র-কিরণ ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। শাশুড়ি সমস্ত অলঙ্কারগুলি পোটলায় বাঁধিয়া চলিয়া আসিবার জন্য মুখ ফিরাইতেই তাহার মুখে চন্দ্রের কিরণ পড়িল এবং সেই আলোকে আরিফ যাহার মুখ দেখিল, তাহাকে সে মাতার অপেক্ষাও ভক্তি করে। তাহার মুখে-চোখে-মনে অমাবস্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। এত কুৎসিত এ পৃথিবী!

সত্যিই দেখেছ তাকে?'

আরিফ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, 'জি হাঁ দেখেছি! কলিকাল কিনা, তাই সব কিছু উল্টে গেছে! যার চুরি গেছে, তারি চোরের হাত চেপে ধরার কথা, এখন কিন্তু চোরই যার চুরি গেছে তার হাত চেপে ধরে!'

শ্বশুর যেন আহত হইয়া হাত ছাড়িয়া দিল।

আরিফ জোহরাকে ডাকিয়া রাত্রির সমস্ত ব্যাপার বলিল ও ইঙ্গিতে ইহাও জানাইল যে হয়তো এ ব্যাপারে তাহারও হাত আছে!

জোহরা মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল! তাহার মূর্ছা ভাঙ্গিবার পর আরিফ বলিল, 'সে এখনি এ বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। এ নরক-পুরীতে সে আর এক মুহূর্তও থাকিবে না।'

শ্বশুরশা শুড়ি যেন পাথর হইয়া গিয়াছিল; এমনকি জোহরার মূর্ছাও আরিফই ভাঙ্গাইল, পিতামাতা কেহ আসিয়া সাহায্য করিল না।

আরিফ চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই জোহরা তাহার পায়ে লুটাইয়া বলিল, 'আমাকে নিয়ে যাও, আমাকে এখানে রেখে যেয়ো না। খোদা জানেন, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আমি কোন অপরাধ করিনি।'

আরিফ জোহরার কান্নাকাটিতে রাজি হইল তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে।

স্বামীর নির্দেশমত জোহরা পিতামাতা কে আর কিছুই প্রশ্ন করিল না।

চার.

চলিয়া যাইবার সময় জোহরার পিতামাতা ছুটিয়া আসিয়া কন্যা-জামাতার হাত ধরিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল, তাহারা বাসিমুখে বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে পারে না। অন্তত সামান্য কিছু খাইয়া লইয়া তবে তাহারা যেন যায়!

আরিফ হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, এ বাড়ির বায়ুতেও যেন কিসের পূতিগন্ধ! তবু সে খাইয়া যাইতে রাজি হইল, সে আজ দেখিবে– মানুষের ভ-ামির সীমা কতদূর।

জোহরা যত জিদ করিতে লাগিল, সে এ বাড়িতে আর জলস্পর্শও করিবে না, আরিফ ততই জিদ ধরিল, না, সে খাইয়াই যাইবে।

জোহরা তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল, সে কিছু খাইল না। আরিফ কিন্তু খাইবার মিনিট কয়েকের মধ্যেই বমি করিতে লাগিল।

জোহরা আবার মূর্ছিতা হইয়া পড়িল! সে মূর্ছার পূর্বে মায়ের দিকে তাকাইয়া একটি কথা বলিয়াছিল– 'রাক্ষুসী!'

আরিফের বুঝিতে বাকি রহিল না সে কি খাইয়াছে।

কিন্তু এখানে থাকিয়া মরিলে চলিবে না! এই মৃত্যুর ইতিহাস সে তাহার পিতামাতা কে বলিয়া যাইবে। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে স্টেশন অভিমুখে ছুটিল।

স্টেশনে পৌঁছিয়াই সে ভীষণ রক্তবমন করি তে লাগিল। রক্তবমন করিতে করিতেই সে প্রায় চলন্ত ট্রেনে গিয়া উঠিয়া পড়িল।

ট্রেন তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। স্টেশন মাস্টার চিৎকার করিতে করিতে সে তখন ট্রেনে গিয়া উঠিয়া বসিয়াছে।

কামরা হইতে একজন সাহেবী পোশাকপরা বাঙালি চেঁচাইয়া উঠিলেন, 'এটা ফার্স্ট ক্লাস, নেমে যাও, নেমে যাও।'

আরিফ কোন কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই আবার রক্তবমন করি তে লাগিল।

দৈবক্রমে যে বাঙালি সাহেবটি ট্রেনে যাইতেছিলেন, তিনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত ডাক্তার।

আরিফ অস্ফুট স্বরে একবার মাত্র বলিল, 'আমায় বিষ খাইয়েছে, আমার–'

বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। ডাক্তার সাহেব মফঃস্বলের এক বড় জমিদার বাড়ির 'কলে' গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গেই ঔষধপত্রের বাক্স ছিল। তিনি তাড়াতাড়ি 'সার্ভেন্ট' কামরা হইতে চাকরকে ডাকিয়া, তাহার সাহায্যে আরিফকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া নাভি পরীক্ষা করিয়া ইনজেকশন দিলেন। দুই তিনটা ইনজেকশন দিতেই রোগীকে অনেকটা সুস্থ মনে হইতে লাগিল। বমি বন্ধ হইয়া গেল।

ইচ্ছা করিয়াই ডাক্তারসাহেব গাড়ি থামান নাই। কারণ গাড়ি কলিকাতা পঁহুছিতে দেরি হইলে হয়তো এ হতভাগ্যকে আর বাঁচানো যাইবে না।

ট্রেন কলিকাতায় পৌঁহুছিলে, ডাক্তারসাহেব এ্যাম্বুলেন্স করিয়া আরিফকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

জোহরা সত্য সত্যই পয়মন্ত, আরিফ মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

এদিকে জোহরা চৈতন্য লাভ করিতেই যেই সে শুনিল, তাহার স্বামী চলিয়া গিয়াছে, তখন সে উন্মাদিনীর মত ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার পিতার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, তাহাকে এখনি তাহার শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হোক।

প্রতিবেশীরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া, প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

জোহরার পিতামাতা সকল কে বুঝাইলেন, কন্যার সমস্ত অলঙ্কার গত রাত্রে চুরি যাওয়ায় জামাতা পুলিশে খবর দিতে গিয়াছে, মেয়েও সেই শোকে প্রায় উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে।

পীর সাহেবের অভিশাপের ভয়ে লোকে বাড়িতে ভিড় করিতে পারিল না, কৌতূহল দমন করিয়া সরিয়া গেল।

পাঁচ.

তিন দিন তিন রাত্রি যখন কন্যা জলস্পর্শও করিল না, তখন পিতা পাল্কি করিয়া কন্যাকে রসুলপুর পাঠাইয়া দিয়া পুণ্য করিবার মানসে মক্কা যাত্রা করিলেন।

আরিফও সেই দিন সকালে কলিকাতার হাসপাতাল হইতে মোটরযোগে বাড়ি ফিরিয়াছে!

আশ্চর্য! সে বাড়ি ফিরিয়া কিন্তু পিতামাতা কে কিছু বলিল না। এই তিন দিন ধরিয়া সে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অনেক কিছু ভাবিয়াছে। পিতা শুনিলে, তাহাদের খুন করিতে ছুটিবেন। তাহারা তো মরিবেই, তাহার পিতাকেও সে সেই সাথে হারাইবে। জোহরাও আত্মহত্যা করিবে!

জোহরা! জোহরা! ঐ তিনটি অক্ষরে যেন বিশ্বের মধু সঞ্চিত! সে মৃত্যুকে স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, দৈবকে ভিন্ন কাহাকেও সে দোষী করিবে না। বাহিরেও না, অন্তরেও না!

সে তখনও জানে না যে, সে আবার বাঁচিয়া ফিরিয়াছে! আর কাহাকে সে অপরাধী করিবে? তাহারা যে তাহারি প্রিয়তমার পরমাত্মীয়! বাঁচিয়া উঠিয়া সে যেন নব জীবন লাভ করিয়াছে। এ যেন তার আর এক জন্ম। মৃত্যুর স্পর্শ তাহাকে সোনা করিয়া দিয়াছে।

পুত্রের মুখ দেখিয়া পিতামাতা চমকিয়া উঠিলেন, 'একি, এমন নীল হয়ে গেছিস কেন? একি চেহারা হয়েছে তোর?'

আরিফ শান্ত স্বরে বলিল, 'কলেরা হয়েছিল, এসিয়াটিক কলেরা। বেঁচে এসেছি এই যথেষ্ট।'

পিতামাতা পু ত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শত দরিদ্রকে ডাকাইয়া দানখয়রাৎ করি লেন। সন্ধ্যায় বাড়িতে মৌলুদ শরীফের ব্যবস্থা করিলেন।

তখনো সূর্য অস্ত যায় নাই, এমন সময় বাড়ির দ্বারে আসিয়া জোহরার পাল্কি থামিল।

জোহরা পাল্কি হইতে মৃত্যুপ্রা -র মুখে নামিতেই সম্মুখে আরিফকে দেখিয়া চিৎকার করিয়া তাহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'তুমি এসেছ– বেঁচে ফিরে এসেছ?'

বলিতে বলিতে সে মূর্ছিতা হইয়া পড়িল। সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। মূর্ছা ভাঙ্গিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, আরিফের পিতামাতা কাঁদি তে কাঁদিতে বলিলেন, 'তোরা দু'জনই কি মরতে মরতে ফিরে এলি?'

মাতা কাঁদিতে লাগিলেন, 'আমার সোনার প্রতিমার কে এমন অবস্থা করলে!'

আরিফ জোহরাকে নিভৃতে ডাকিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। জোহরা স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল, 'না, না, তুমি শান্তি দাও। তোমরা আমায় ঘৃণা কর, মার!'

আরিফ জোহরার অধর দংশন করিয়া বলিল, 'এই নাও শাস্তি!'

ছয়.

দুঃখবিপ দের এই ঝড়ঝ ঞ্ঝার মাঝেও জোহরা তাহার পদ্ম-গোখ্‌রোর কথা ভুলে নাই। এতদিন সে তেমনি নীরবে তাহাদের কথা ভুলিয়া আছে, যেমন করিয়া সে তাহার মৃত খোকাদের ভুলিয়াছে। কিন্তু সে কি ভুলিয়া থাকা! এই নীরব অন্তর্দাহের বিষজ্বালা তাহাকে আজ মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত ঠেলিয়া আনিয়াছে! সে সর্বদা মনে করে, সে বেদেনী, সে সাপুড়ের মেয়ে! সে ঘুমে জাগরণে শুধু সর্পের স্বপ্ন দেখে। সে কল্পনা করে, তাহার স্বামী নাগলোকের অধীশ্বর, সে নাগমাতা, নাগরা জেশ্বরী!

বাড়িতে আসিয়া অবধি কাহাকেও পদ্ম-গোখ্‌রোর কথা জিজ্ঞাসা না করায়, শ্বশুরশা শুড়ি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, বৌ ওদের কথা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে।

গভীর রাত্রে জোহরা স্বপ্নে দেখিতেছিল, তাহার মৃত খোকা দুইজন যেন আসিয়া বলিতেছে, 'মাগো, বড় ক্ষিদে, কতদিন আমাদের দুধ দাওনি। আমরা কবরে শুয়ে আছি, আর উঠতে পারিনে। একটু দুধ! মা! একটু দুধ! বড় ক্ষিদে!' 'খোকা' 'খোকা' বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া জোহরা জাগিয়া উঠিল। দেখিল, স্বামী ঘুমাইতেছে। প্রদীপ জ্বালিয়া কি যেন অন্বেষণ করিল, কেহ কোথাও নাই।

সে আজ উন্মাদিনী। সে আজ শোকাতুরা মা, সে পুত্রহারা জননী! তাহার হারা-খোকা ডাক দিয়াছে, তাহারা ছয় মাস না খাইয়া আছে!

পাগলের মত সে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ির সম্মুখেই মীর পরিবারের গোরস্থান। ক্ষীণ শিখা প্রদীপ লইয়া উন্মাদিনী মাতা দুইটি ছোট কবরের পার্শ্বে আসিয়া থামিল। পাশাপাশি দুইটি ছোট কবর, যেন দু'টি যমজ ভাই– গলাগলি করিয়া শুইয়া আছে।

শিয়রে দুইটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ, জোহরাই স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিল। এইবার তাহাতে ফুল ধরিয়াছে। রক্তবর্ণের ফুলে ফুলে করব দুইটি ছাইয়া গিয়াছে।

মাতা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'খোকা! খোকা! কে তোদের এত ফুল দিয়াছে বাবা। খোকা!'

মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল, না ঐ কবর ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল– জানে না, জাগিয়া উঠিয়াই জোহরা দেখিল, তাঁহার বুকে কু-লী পাকাইয়া সেই পদ্ম-গোখ্‌রোযুগল।

জোহরা উন্মত্তের মত চিৎকার করিয়া উঠিল, 'খোকা, আমার খোকা, তোরা এসেছিস, তোদের মাকে মনে পড়ল?' জোহরা আবেগে সাপ দুইটিকে বুকে চাপিয়ে ধরিল, সর্প দুইটিও মালার মত তাহার কণ্ঠবা হু জড়াইয়া ধরিল।

তখন ভোর হইয়া গিয়াছে।

জোহরা দেখিল পদ্ম-গোখ্‌রোদ্বয়ের সে দুগ্ধধবল কান্তি আর নাই, কেমন যেন শীর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বারে বারে জিভ বাহির করিয়া যেন তাহাদের তৃষ্ণার কথা, ক্ষুধার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে– মা গো বড় ক্ষিদে! তুমি তো ছিলে না, কে খেতে দেবে? একটু দুধ! বড় ক্ষিদে মা, বড় ক্ষিদে!

জোহরা তাহাদের বুকে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তখনো কেহ জাগিয়া উঠে নাই।

সে হেঁসেলে ঢুকিয়া দেখিল, কড়াভরা দু গ্ধ।

বাটিতে করিয়া দিতেই সাপ দুইটি বুভুক্ষের মত বাটিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। যেন কত যুগযুগান্তরের ক্ষুধাতুর ওরা!

জোহরার দুই চক্ষু দিয়া তখন অশ্রুর বন্যা বহিয়া চলিয়াছে।

শাশুড়ি উঠিয়া বধূর কীর্তি দেখিয়া মূক স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; বধূ তাঁহাকে দেখিতে পাইবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, 'ও মা, কি হবে এ বালাইরা এ ছয় মাস কোথায় ছিল? যেমনি তুমি এসেছ, আর অমনি গায়ের গন্ধে এসে হাজির হয়েছে!'

জোহরা আহত স্বরে বলিয়া উঠিল, 'ষাট, ওরা বালাই হবে কেন মা? ওরা যে আমার খোকা!'

শাশুড়ি বুঝিতে পারিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, 'সত্যিই ওরা তোমার খোকা বৌমা। তুমি চলে যাবার পর আমরা দু'একদিন ওদের দুধ দিয়েছিলাম। ওমা শুনলে অবাক হবে, ওরা দুধ ছুঁলেই না! চলে গেল! সাপও মানুষ চেনে। কলিকালে আরও কত কি দেখব!'

সাপ দুইটি তখন বোধ হয় অতিরিক্ত দুগ্ধপানবশতই নির্জীবের মত বধূর পায়ের কাছে শুইয়া পড়িয়াছিল।

সাত.

সেইদিন সন্ধ্যারাত্রিতে বাড়ির একজন দাসী চিৎকার করিয়া উঠিল, 'ও মা গো, ভূতে ধরল গো! জিনের বাদশা গো! জিন ভূত!'

বলিয়াই সে প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িল। বাড়িময় ভীষণ হই চই পড়িয়া গেল।

আরিফের মাতা তখন আরিফকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন, 'হাঁ রে, বৌমা যে আবার পোয়াতি, তা তো বলিসনি। ওর যে ব্যথা উঠেছে।'

আরিফ বলিতেছিল, 'কিন্তু এখন তো ব্যথা ওঠার কথা নয় মা, মোটে তো সাত মাস।'

এমন সময় বাড়িময় শোরগোল উঠিল, 'ভূত! ভূত! য়্যাদ্দাড়িওয়ালা ভূত!'

বাড়ির চাকরচাকরানী সক লে বলিল, তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে– জ্যান্ত ভূত! আকাশে গিয়া তাহার মাথা ঠেকিয়াছে! বাড়ির মধ্যে আমগাছতলায় দাঁড়াইয়া আ ছে।

আরিফ, আরিফের মাতা লণ্ঠন লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। সত্যই তো কে যেন গাছতলায় প্রেতমূর্তির মত দাঁড়াইয়া!

তাঁহাদের পিছনে পিছনে যে ভূত দেখিতে জোহরাও বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহা কেহ দেখে নাই।

হঠাৎ ভূত চিৎকার করিয়া উঠিল, 'ওরে বাপরে, সাপে খেলে রে!'

জোহরা চিৎকার করিয়া উঠিল, 'বাবা তুমি!' আরিফের মাতাও বলিয়া উঠিল, 'য়্যাঁ বেয়াই?'

জোহরা তখন চিৎকার করিতেছে, 'ও সত্যই ভূত। বাবা নয়, বাবা নয়, ও ভূত! ওকে মার! মেরে বের করে দাও!'

হঠাৎ সে শুনিতে পাইল, ভূত যেন যষ্টিদ্বারা নির্দয়ভাবে কাহাকে প্রহার করিতে করিতে চিৎকার করিতেছে– 'ওরে বাপরে সাপে খেয়ে ফেললে! আমায় সাপে খেয়ে ফেলল!'

জোহরা উন্মাদিনীর মত তাহার শাশুড়ির হাতের লণ্ঠন কাড়িয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল– 'ওগো আমার খোকাদের মেরে ফেললে। ওকে ধর। ওকে ধর!'

জোহরার সাথে সাথে সকলে আমগাছতলায় গিয়া দেখিল, ভূত সত্যই আর কেহ নয়, সে জোহরার পিতা। তাহাকে তাহাদের বাস্তু সাপ পদ্ম-গোখ্‌রোদ্বয় নির্মমভাবে দংশন করিতেছে এবং ততোধিক নির্মমভাবে সে সর্পদ্বয়কে প্রহার করিতেছে।

জোহরা একবার 'খোকা' এবং একবার 'বাবা' বলিয়াই মূর্ছিতা হইয়া পড়িল।

জ্ঞান হইলে জোহরা আরিফকে ডাকিল। সকলে সরিয়া গেলে, সে জিজ্ঞাসা করিল– 'আমার খোকারা কই? আমার পদ্ম-গোখ্‌রো? আমার বাবা?'

আরিফ কাঁদিয়া বলিল, 'জোহরা। জোহরা! কেউ নেই! সব গেছে! সকলে গেছে! তোমার বাবা মরেছেন পদ্ম-গোখ্‌রোর কামড়ে!'

'তোমার মা মারা গেছেন কলেরা হয়ে। ওঁরা মক্কা যাচ্ছিলেন। তোমার মা রাস্তায় মারা গেলে, তোমার বাবা অনুতপ্ত হয়ে তোমায় শেষ দেখা দেখতে আসেন লুকিয়ে। লুকিয়েই হয়তো তোমায় দেখে চলে যেতেন। এমন সময় চাকরানী দেখতে পেয়ে ভূত বলে চিৎকার করে! ঠিক সেই সময় তোমার পদ্ম-গোখ্‌রো তাঁকে তাড়া করে!'

জোহরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'বেশ হয়েছে, জাহান্নামে গেছে ওরা! যাক। আমার পদ্ম-গোখ্‌রো– আমার খোকারা কোথায় বল!'

আরিফ বলিল, 'তোমার বাবা তাদের মেরে ফেলেছেন!'

জোহরা, 'এ্যাঁ খোকারা নাই?' বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ভোর হইতে না হইতে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, মীর সাহেবদের সোনার বৌ এক জোড়া মরা সর্প প্রসব করিয়া মারা গিয়াছে।

কাজী নজরুল ইসলাম
প্রয়াত বিদ্রোহী কবি, লেখক, সাংবাদিক, গীতিকার

প্রভাতী

ভোর হোলো
দোর খোলো
খুকুমণি ওঠো রে!
ঐ ডাকে
জুঁই-শাখে
ফুল-খুকি ছোটো রে!
খুকুমণি ওঠো রে!
রবি মামা
দেয় হামা
গায়ে রাঙা জামা ঐ,
দারোয়ান
গায় গান
শোনো ঐ, 'রামা হৈ!'
ত্যাজি নীড়
করে ভিড়
ওড়ে পাখি আকাশে
এন্তার
গান তার
ভাসে ভোর বাতাসে।
চুলবুল
বুল্‌বুল্‌
শিস দেয় পুষ্পে,
এইবার
এইবার
খুকুমণি উঠবে!
খুলি হাল
তুলি পাল
ঐ তরী চলল,
এইবার
এইবার
খুকু চোখ খুলল!
আলসে
নয় সে
ওঠে রোজ সকালে,
রোজ তাই
চাঁদা ভাই
টিপ দেয় কপালে।
উঠল
ছুট্‌ল
ঐ খোকাখুকি সব,
'উঠেছে
আগে কে'
ঐ শোনো কলরব।
নাই রাত,
মুখ হাত
ধোও, খুকু জাগো রে!
জয়গানে
ভগবানে
তুষি বর মাগো রে!

ঝুম্‌কোলতায় জোনাকি

ঝুমকোলতায় জোনাকি–
মাঝে মাঝে বিষ্টি গো
আবোলতাবোল বকে কে
তারও চেয়ে মিষ্টি গো
মিষ্টি, মিষ্টি।
আকাশে সব ফ্যাকাশে
ডালিম-দানা পাকেনি,
চাঁদ ওঠেনি কোলে তার
মা বলে সে ডাকেনি

রাগ করেছে বাঘিনী
বারো বছর হাসে না,
স্বপ্ন তাহার ভেঙে যায়
খোকা কেন আসে না।
পাথর হয়ে আছে– ঝিনুক দুধের বাটি দোলে না
মাকে বলে– 'খোকা কই
কিছুই খেলা হলো না।
কিছুই ভালো লাগে না।'

কেঁদে বলে ঘরের জিনিস– 'যেমন ছিলাম তেমনি আছি–
খোকা কেন ভাঙে না,
কিছুই ভালো লাগে না।'

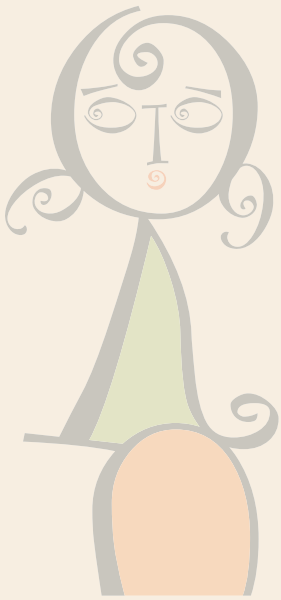

নতুন পথিক

নতুন দিনের মানুষ তোরা
আয় শিশুরা আয়!
নতুন চোখে নতুন লোকের
নতুন ভরসায়।
নতুন তারার বেভুল পথিক
আসলি ধরাতে
ধরার পারে আনন্দ-লোক
দেখাস ইশারায়।
খেলার সুখে মাখলি তোরা
মাটির করুণা,
এই মাটিতে স্বর্গ রচিস,
তোদের মহিমায়।

চড়ুই পাখির ছানা

মস্ত বড় দালান-বাড়ির উঁই-লাগা ঐ কড়ির ফাঁকে
ছোট্ট একটি চড়াই-ছানা কেঁদে কেঁদে ডাকছে মা'কে।
'চু চা' রবে আকুল কাঁদন যাচ্ছিল নে' বসন-বায়ে,
মায়ের পরান ভাবলে– বুঝি দুষ্টু ছেলে নিচ্ছে ছা-য়ে।
অমনি কাছের মাঠটি হতে ছুটল মাতা ফড়িং মুখে,
স্নেহের আকুল আশিস-জোয়ার উথ্‌লে ওঠে মা'র সে বুকে।
আধ-ফুরফুরে ছাটি নীড়ে দেখছে মা তার আসছে উড়ে,
ভাবলে আমি যাই না ছুটে, বসি গে' মা'র বক্ষ জুড়ে।
হৃদয় আবেগ রুধতে নেরে উড়তে গেল অবোধ পাখি,
ঝুপ করে সে গেল পড়ে– ঝরল মায়ের করম্নণ আঁখি!
হায়রে মায়ের স্নেহের হিয়া বিষম ব্যথায় উঠল কেঁপে,
রাখলে নাকো প্রাণের মায়া, বসল ডানায় ছাটি ঝেঁপে।
ধরতে ছোটে ছানাটিরে ক্লাসের যত দুষ্টু ছেলে;
ছুটছে পাখি প্রাণের ভয়ে ছোট্ট দুইটি ডানা মেলে।
বুঝতে নারি কি সে ভাষায় জানায় মা তার হিয়ার বেদন,
বুঝে না কেউ ক্লাসের ছেলে– মায়ের সে যে বুকভরা ধন!
পুরছে কেহ ছাতার ভিতর, পকেটে কেউ পুরছে হেসে
একটি ছেলে দেখছে, আঁসু চোখ দু'টি তার যাচ্ছে ভেসে।
মা মরেছে বহুদিন তার, ভুলে গেছে মায়ের সোহাগ,
তবু গো তা মরম ছিঁড়ে উঠল বেজে করুণ বেহাগ।
মই এনে সে ছানাটিরে দিল তাহার বাসায় তুলে,
ছানার দু'টি সজল আঁখি করলে আশিস পরান খুলে।
অবাক-নয়ান মা'টি তাহার রইল চেয়ে পাঁচুর পানে,
হৃদয় ভরা কৃতজ্ঞতা দিল দেখা আঁখির কোণে।
পাখির মায়ের নীরব আশিস যে ধারাটি দিল ঢেলে,
দিতে কি তার পারে কণা বিশ্বমাতার বিশ্ব মিলে।

লিচু-চোর

বাবুদের তাল-পুকুরে
হাবুদের ডাল-কুকুরে
সে কি বাস্ করলে তাড়া,
বলি থাম্, একটু দাঁড়া!
পুকুরের ঐ কাছে না
লিচুর এক গাছ আছে না
হোথা না আস্তে গিয়ে
য়্যাব্বড় কাস্তে নিয়ে
গাছে গ্যে যেই চড়েছি
ছোট এক ডাল ধরেছি,
ও বাবা, মড়াৎ করে
পড়েছি সড়াৎ জোরে!
পড়বি পড় মালির ঘাড়েই,
সে ছিল গাছের আড়েই
ব্যাটা ভাই বড় নচ্ছার,
ধুমাধুম গোটা দুচ্চার
দিলে খুব কিল ও ঘুসি
একদম জোরসে ঠুসি!
আমিও বাড়িয়ে থাপড়
দে হাওয়া চাগিয়ে কাপড়
লাফিয়ে ডিঙ্‌নু দেয়াল,
দেখি এক ভিট্‌রে শেয়াল!
আরে ধ্যাৎ শেয়াল কোথা?
ভেলোটা দাঁড়িয়ে হোথা!
দেখে যেই অ্যাঁৎকে ওঠা
কুকুরও জুড়ুল ছোটা!
আমি কই কম্ম কাবার
কুকুরেই করবে সাবাড়!
'বাবা গো মা গো' বলে
পাঁচিলের ফোঁকল গলে
ঢুকি গ্যে বোসদের ঘরে,
যেন প্রাণ আসল ধড়ে!
যাব ফের? কান মলি ভাই,
চুরিতে আর যদি যাই!
তবে মোর নামই মিছা!
কুকুরের চাম্‌ড়া খিঁচা
সে কি ভাই যায় রে ভুলা–
মালির ঐ পিট্‌নিগুলা!
কি বলিস? ফের হপ্তা?
তৌবা– নাক খপ্‌তা।

জীবাণু থেকে সুরক্ষায়
ডেটল গোসল প্রতিদিন!

Dettol

BE 100% SURE

বেছে নিন আপনার পছন্দের ডেটল সাবান

PRIVATE MEDICAL PRACTITIONERS ASSOCIATION BANGLADESH ESTD 1977
*BPMPA

ডাক্তারদের দ্বারা স্বীকৃত
বাংলাদেশের একমাত্র সাবান

www.dettol.com.bd
facebook.com/dettolbd

ধারাবাহিক উপন্যাস

নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময়

সেলিনা হোসেন

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

সোহেল আর বকুল দু'জনে একসঙ্গে আঁতকে উঠে বলে, বিয়ে? এখন যাবার সময় বিয়ে?

হ্যাঁ, বিয়ে।

শিউলি কঠিন স্বরে কথা বলে। মুখ শক্ত করে রাখে। বলতে চায়, তোমাদের সম্পর্কটা কতদূর গেছে তা আমার ধারণা হয়েছে। আমাকে বোকা ভেবো না। আর কথা না বাড়িয়ে ওদেরকে পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভেতর ঢোকে। ধানের গাদার কাছে দাঁড়িয়ে বিষয়টি যাচাই করতে চায়। দেখতে পায় দু'জনের পিঠের চাপে ধানের গাদার এক অংশ চ্যাপ্টা হয়ে আছে, বিছানা যেন! ভেসে আসে ওদের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ!

যাই রে বকুলি।

আর একটু থাক।

বুবু এসেছে না বাড়িতে?

আসুক। তাতে হয়েছে কি? বুবু আমার গার্জিয়ান নাকি?

বড় বোন তো গার্জিয়ানই হয়। মায়ের মত সংসারের হাল ধরেছে না?

রাখো তো এতকথা। হাতটা দাও ধরি।

না, আমি যাই।

আর একটু থাকো।

না না থাকা ঠিক হবে না।

তুমি একটা ভীতুর ডিম।

বুবু, স্কুল মাস্টারনি। বুবুর সামনে বেয়াদবী করা ঠিক না।

বাজানের চকচকে চেহারা দেখে শিউলির মনের ভার কমে যায়। ভাবে, বাজানকে আজ পরীর মত লাগছে। পরক্ষণে নিজেকে ধমকায়, ধুত্ ছেলেদেরকে পরীর মত লাগবে কেন? বাপকে সুন্দর লাগছে। রাজপুত্রের মত লাগছে। শিউলি খুশি হয়ে ঝোলা থেকে আনাজপাতি নামায়। মাছ-ডিম নামায়। কালিজিরার ভর্তা খেতে ভালবাসে জয়নুল মিয়া। রাশিদুন নিজে কালিজিরার ভর্তা বানাতো জয়নুল মিয়ার জন্য। ব্যাগের মধ্যে কালিজিরার পোটলা খুঁজে পায় শিউলি। নিজে নিজে হাসে ও।

ও বাব্বা, মুরুব্বী জ্ঞান দেখি টনটনা।

বকুলী ফাজলামি করিস না। ঘরে যা।

সোহেল দ্রুতপায়ে চলে যায়। বকুল ক্ষুব্ধ হয়। সোহেলের আবেগ আরো যেটুকু হওয়ার কথা ছিল সেটুকু হল না। যেন কাজ শেষ হয়েছে, আর দাঁড়ানোর দরকার নেই, এমন একটি ভাব ওর চলে যাওয়ার মধ্যে ফুটে ওঠে। ও একবারও পেছন ফিরে তাকায় না। বকুল মনে মনে খুশি হয় যে পুরো কাজটি ও হতে দেয়নি। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!

ও ধানের কুটো দোলাতে দোলাতে বাড়িতে ঢোকে। দেখতে পায় শিউলি বারান্দায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কোমরে হাত দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বলে, কি হয়েছে? এভাবে বসে আছ যে?

তুই কি ভেবেছিস, তুই ঘরের বিছানায় সুবি, আর আমি চুলো ঠেলব?

না, তা ভাবিনি।

তাহলে গোসল করে আয়।

বুবু!

যা বলেছি তা কর। নইলে তোকে আমি ঘরে ঢুকতে দেব না। চিৎকার করে বাড়ি মাতাবো।

তোমার কি মাথা ঠিক আছে? তুমি এসব কি বলছ? আমার কিছু হয়নি।

হয়নি?

শিউলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে ঘাড় ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলে, না, হয়নি হয়নি। আমি এত বোকা না।

একসময় ঘাড় ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দেয় বকুল। শিউলিও কিল-চড় দিতে দিতে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। দু'বোনের ছোটখাটো মারামারি হয়ে যায়। দু'জনেই ভেবে দেখল, এমন একটি ঘটনা এই প্রথম। এতদিন জীবন একরকম ছিল। আজ একটি বাঁকবদলের সূচনা হল। জামাকাপড় ঠিক করতে করতে বকুল ভাবে, এর কারণ ওর প্রেমের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক শিউলিকে আহত করেছে। শিউলি জানতে পারছে না। নইলে, না জেনে এতবড় কথা বলবে কেন? শিউলি নিজেও জামাকাপড় ঠিক করতে করতে ভাবে, আজ থেকে বকুল ওর থেকে আলাদা হয়েও গেল। বাড়িতে ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক হবে এত সাহস ওর কোথা থেকে হল? মা, বাড়িতে থাকলে এমন ঘটনা ঘটত না। ও বুক চাপড়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। বকুল আবার কোমরে হাত দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, কাঁদাকাটি করতে চাইলে আমি বিদেশ যাওয়ার পরে কাঁদ। আমার শুনতে হবে না। তুমি মনে রেখ বুবু, আমি তোমার মত আইবুড়ো হব না। আমি ঘর চাই, পোলাপান চাই।

থাম ছেমড়ি থাম। শিউলি চিৎকার করেই বলে।

বকুলও চিৎকার করে বলে, আমি কিছুতেই তোমার মত আইবুড়ো হব না।

হবি না তো হবি না। কে বলেছে তোকে আইবুড়ো হতে?

তুমি, তুমি বুবু। সেজন্য হিংসেয় জ্বলে যাচ্ছ। সেজন্য তুমি আমাকে শাসাচ্ছ। তোমার শাসনের কেচ্ছা আমি বুঝি। ঢং মেরো না।

তোর এত বাড় বেড়েছে বকুলি? তুইতো এমন ছিলি না? তুই ভেবেছিস তুই এখন দুইজন? একা না। আর তোর সঙ্গে আমি পেরে উঠব না? তাইতো?

হ্যাঁ, তাই তাই।

হিংস্র দেখায় বকুলকে। শিউলি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। ঠিক করে, আর কথা বাড়াবে না। ও সবার বড় বোন। ছোটদের বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে। ও নিজের পিঠ-বোঝাই চুল খোঁপা বাঁধে। ঘরে ঢুকে ব্যাগ-ছাতা রাখে। শাড়ি বদলায়। দু'হাতে চোখের জল মোছে। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছে না। পরিস্থিতি একদিন এমন হবে একথা ও স্বপ্নেও ভাবেনি। বুকভরা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে রান্নাঘরে এসে ঢোকে। দেখতে পায় দুই ঝোলা বাজার নিয়ে বাবা বাড়িতে ঢুকছে। গেট থেকেই ডাকছে, মা শিউলি–।

শিউলি মাথা তোলে না। তাকায় না। শুধুই নিজেকে সামলায়। চোখের জলের ধারা কমেছে। আঁচলে মুখ মুছে মুখ তুলে দেখতে পায় জয়নুল মিয়া রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

কি হয়েছে মাগো?

মায়ের কথা মনে হয়েছে।

জয়নুল মিয়া হেসে বলে, তোমার মা ভাল আছে। হাটে মুন্সী বয়াতীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। ও বলল, তোমার মা কাজী বাড়ি যাওয়ার পথে বয়াতীর সামনে পড়ে। তাকে দেখে জিজ্ঞেস করেছে, আমার মেয়েরা কেমন আছে গো বয়াতী? বয়াতী যখন বলেছে, ভাল আছে, তখন জিজ্ঞেস করেছে, ওদের আব্বাজান ভাল আছে তো? বয়াতী বলেছে, ভাল আছে।

আপনি খুব খুশি হয়েছেন বাজান?

খুশি হয়েছি মাগো, অনেক খুশি হয়েছি। সেজন্য দোকানীর কাছে বাকি থুয়ে এত সদাই করেছি। তোমরা আজকে মনের মত রান্নাবাড়া করো মাগো।

বাজানের চকচকে চেহারা দেখে শিউলির মনের ভার কমে যায়। ভাবে, বাজানকে আজ পরীর মত লাগছে। পরক্ষণে নিজেকে ধমকায়, ধুত্ ছেলেদেরকে পরীর মত লাগবে কেন? বাপকে সুন্দর লাগছে। রাজপুত্রের মত লাগছে। শিউলি খুশি হয়ে ঝোলা থেকে আনাজপাতি নামায়। মাছ-ডিম নামায়। কালিজিরার ভর্তা খেতে ভালবাসে জয়নুল মিয়া। রাশিদুন নিজে কালিজিরার ভর্তা বানাতো জয়নুল মিয়ার জন্য। ব্যাগের মধ্যে কালিজিরার পোটলা খুঁজে পায় শিউলি। নিজে নিজে হাসে ও। বুঝতে পারে, মনের আনন্দে তার বাবা প্রিয় খাবারের জিনিস কিনেছে। কালিজিরা কিনে ওর মাকে মনে করেছে। আনন্দের দিনের ছবি দেখেছে। খুশিতে আত্মহারা হয়ে বাড়ি ফিরেছে। একটু পরে শিউলি টের পায় ওর বাবা রান্নাঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মাগো, বয়াতী বলেছে তোমার মা বয়াতীর কাছে একটা গান শুনতে চেয়েছে। বলেছে, বয়াতী ভাই অনেকদিন আগে আপনি একটা গান গাইতেন সেই গানটা আজকে গাইবেন। আমি দূর থেকে আপনার গান শুনব। গানটা শিউলির বাপের খুব পছন্দ ছিল। বয়াতী বলেছিল, কোন গানের কথা বলছেন তা কি আপনার মনে আছে? তোমার মা নাকি হেসে বলেছে, মনে থাকবে না আবার! সেই গানের কথা কি আমি ভুলতে পারি? তারপর নিজেই নাকি গানের এক লাইন গেয়েছে।

বাজান কিছু বলবেন?

মাগো, বয়াতী বলেছে তোমার মা বয়াতীর কাছে একটা গান শুনতে চেয়েছে। বলেছে, বয়াতী ভাই অনেকদিন আগে আপনি একটা গান গাইতেন সেই গানটা আজকে গাইবেন। আমি দূর থেকে আপনার গান শুনব। গানটা শিউলির বাপের খুব পছন্দ ছিল। বয়াতী বলেছিল, কোন গানের কথা বলছেন তা কি আপনার মনে আছে? তোমার মা নাকি হেসে বলেছে, মনে থাকবে না আবার! সেই গানের কথা কি আমি ভুলতে পারি? তারপর নিজেই নাকি গানের এক লাইন গেয়েছে।

কোন গানটা বাজান? আপনার মনে আছে?

আমারও মনে আছে। আমিও ভুলিনি।

আপনি বলেন বাজান। এক লাইন গানের মত করে গেয়ে বলেন।

জয়নুল রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গুনগুন করে, মন দরিয়ারে তুই কোন অকূলে ছুটলি। ও আমার নিশিন্দারে আমারে ছাড়িয়া তুই যাবি না রে–।

জয়নুলের চোখে পানি আসে। দু'হাতে চোখ মুছে বলে, বয়াতী গান গাইতে গাইতে নিজের পথে চলে যায়। হঠাৎ করে দূরে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে দেখতে পায় তোমার মা তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে। তাকিয়েছিল বয়াতীর দিকে। বয়াতীকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে নিজের পথে হাঁটতে শুরু করে।

মা কোথায় যাচ্ছিল বাজান।

সেই মেয়েটির বাড়িতে যাবে, যার বাবা এসিড খাইয়েছিল।

ওই ছোট মেয়েটি কি দোষ করেছিল বাজান?

মেয়ে হয়ে জন্মাল কেন এইটাই ওর দোষ ছিল।

কথাটি বলে এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না জয়নুল মিয়া। দ্রুত হেঁটে বাড়ির বাইরে চলে যায়। তার সামনে অনেক কাজ। এই ধানকে চাল বানাতে হবে। ঠিক করেছে বকুল বিদেশে যাওয়ার আগেই কাজটি শেষ করবে। একটু পরে বাড়িতে ফিরে আসে অন্যরা। হৈ-চৈয়ে মুখর হয় ধানের পালায় জড়ানো উঠোন। তিনবোন প্রথমে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়ায়। শিউলিকে একা দেখে জিজ্ঞেস করে, বকুল বুবু কই?

শিউলির গম্ভীর কণ্ঠস্বর, জানি না।

পদ্ম হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে, আমাদেরকে না বলেই কি সৌদি চলে গেল? গেলে মজা দেখাব। এ বাড়িতে আর ঢুকতে হবে না।

এত কথা না বলে চল ঘরে গিয়ে দেখি।

তিন বোন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বকুল। মুখটা বালিশে গোঁজা।

কি হয়েছে বুবুর? কাঁদছে নাকি?

না কি বিদেশের ভয়ে জ্বর এসেছে?

আবার হাসির রোল ওঠে। তিন বোন হাসতে হাসতে বকুলের চারপাশে গিয়ে বসে।

কি হয়েছে তোমার? ঘুমাচ্ছ কেন? ওঠ।

বকুল কান্নাভেজা চোখে নিয়ে মাথা তোলে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। তারপর উঠে বসে।

কাঁদছ কেন? তিনজনের একসঙ্গে জিজ্ঞাসা।

মনের আনন্দে কাঁদছি। বিদেশে যাব। টাকা রোজগার করব। বাড়িতে দালান তুলব। মাকে এই বাড়িতে নিয়ে আসব।

বাব্বা, সব তুমি একা একা করবে। এই বাড়িতে আমরা কি ফাও নাকি? উঠ, উঠ। টাকা দাও জিলাপি আনতে পাঠাই নাজিরকে। ও দৌড় দিয়ে যাবে আর আসবে।

তার আগে তোমাদের সঙ্গে আমার কথা আছে।

কি কথা?

বকুল এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, আমি সোহেলকে ভালবাসি।

সোহেল ভাইকে... ভালবাস...

তিনজনের বিস্ময়ের উচ্চারণ। তারপর বকুলের হাত ঝাঁকিয়ে, পা ঝাঁকিয়ে বলে, খুব ভাল করেছ। শিউলি বুবুর মত সন্ন্যাসী হতে চাওনি সেজন্য আমরা খুশি।

হাসুহেনা শুকনো মুখে বলে, তুমিতো সোহেল ভাইয়ের সঙ্গে যাবে। তাহলে, বাজানকে বলি, বকুল বুবুর বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ে ছাড়া সোহেল ভাইয়ের সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না।

তুই কি আমার গার্জিয়ান নাকি?

বকুল দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সোজা হয়ে বসে। হাসুহেনা একই সুরে বলে, ঠিকই বলেছি। এরজন্য আবার গার্জিয়ান হতে হয় নাকি?

আবার যদি বলবি তো দাঁত ফেলে দেব। আমারটা আমি বুঝব। তোদের নাক গলাতে হবে না। শয়তান কোথাকার।

এত মেজাজ করছ কেন? সত্যি কথা গায়ে লাগে না?

হাসুহেনার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বকুল বলে, আর কথা বলবি না।

বলব, একশোবার বলব। আমাদের মান-ইজ্জতের ব্যাপার আছে না?

দু'জনে জাপটা-জাপটি করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। চম্পা আর পদ্ম দু'বোনকে ছাড়ায়। দু'জনের খামচা-খামচিতে গালে- কপালে নখের আঁচড় পড়েছে। রক্তের বিন্দু ফুটে উঠেছে। কেউ আর কোন কথা বলছে না। ফুঁসছে শুধু।

দুপুরের খাবার খেতে বিকেল গড়িয়ে যায়। রান্না করতে সময় লেগেছে শিউলির। খাবার সময় জয়নুল বলে, রাতে বয়াতী আমাদের বাড়িতে আসবে। বলেছে, তোমার মায়ের কথা বলবে। যে মেয়েটিকে ওর বাবা এসিড খাইয়েছে তার কথাও বলবে।

বকুল ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলে, এসব কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। আপনি বয়াতী চাচাকে নিষেধ করেন আমাদের বাড়িতে আসতে।

এখন আমি তাকে কোথায় পাব!

আপনি ভাববেন না বাজান। চাচাকে আসতে বলেন। চাচাকে মা যা

শিউলি বেশ শব্দ করেই থালা-বাসন গোছায়। তারপর কয়েকটি থালা নিয়ে বারান্দা থেকে নামতে নামতে বলে, বাকি কাজ তোরা করবি। আমি পারব না। স্কুলের খাতা দেখার কাজ আছে। প্রত্যেকে অনুভব করে, তাদের সবার বড় বোনটির কণ্ঠস্বর ক্লান্ত। কথায় কথায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আজ ওরা প্রথম অনুভব করে ওদের বড় বোনটি খুব নিঃসঙ্গ। ও যখন বাসন-কোসন হাতে নিয়ে উঠোনে নেমে যায় তখন বকুল বলে, বুবুকে একটা অচিন পাখির মত লাগছে

বলেছে আমরা শুনব।

তোমার কথায় এই বাড়ির সবাই চলবে নাকি?

বকুলের রাগত স্বর শুনে সবাই ওর দিকে তাকায়। জয়নুল মিয়া শান্ত স্বরে বলে, তোর কি হয়েছে মা?

মন ভাল নেই।

ভাত খেয়ে নাজিরদের বাড়ি থেকে ঘুরে আয়।

শুধু এক ঘর থেকে আর এক ঘর।

তোমার সামনে বিদেশ আছে বুবু। আমাদের সামনে কিছু নাই।

বকুল মাথা নিচু করে গপগপিয়ে ভাত খায়। কারো দিকে তাকায় না। দূর থেকে ভেসে আসে বয়াতী মুন্সীর গান। ও মাথা তুলে তীব্র দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকায়। জয়নুল মিয়া ঘাড় নেড়ে বলে, বয়াতীকে না করতে পারব না। ওর কাছ থেকে আমি তোমার মায়ের কথা শুনতে চাই।

বকুলের মাথা থালার উপর নেমে যায়। অন্যরাও ভাত মুখে পোরে। শুধু শিউলি বলে, বয়াতী চাচার গান শুনলে পরান জুড়ায়। আমি চাই বয়াতী চাচা এই বাড়িতে আসুক। আমি তাকে ডাল-ভাত খাওয়াব। তিনিতো ডাল-ভাতই চান।

ঠিক বলেছ মা। মানুষটা একটা ইচ্ছার কথা বলেছে। আমরা কি পারি না তার সাধ মেটাতে।

হ্যাঁ পারি।

শিউলি ছাড়া বাকি চারজন চেঁচিয়ে বলে। শিউলি আর জয়নুল মিয়া হাঁ করে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওদের চোখ জ্বলজ্বল করে। ওদের মুখে ভাত। এক লোকমা ভাত গিলে চারজনই পানির গস্নাস হাতে তুলে নেয়। বলে, বৃষ্টি নামুক মায়ের জন্য। বড় গরম চারদিকে।

শিউলি বুঝতে পারে না এসব কথার মানে কি। ওরা কি বোঝাতে চাচ্ছে। তখন হাস্নুহেনা পানি খেয়ে গস্নাস মাটিতে নামিয়ে রেখে বলে, বাজান!

যেন বাজ পড়ার মত কড়কড় শব্দ হয় চারদিকে। জয়নুল মিয়া চমকে উঠে বলে, কি হয়েছে মা?

বকুলবুবু বিদেশ যাওয়ার আগে সোহেল ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন?

কেন একথা বলছ মা?

কারণ আছে বাজান।

বকুল ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলে, সব ওই শিউলির শেখানো কথা।

শিউলি চেঁচিয়ে ওঠে, মিথ্যে কথা। আমি হাস্নুকে কিছু বলিনি।

হাস্নুহেনা চোখ গরম করে বকুলের দিকে তাকায়, শিউলিবুবু আমাকে কিছু বলেনি।

স্খলিত কণ্ঠে বকুলের শব্দ, ও।

জয়নুল মিয়া মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার কি মত মা?

আপনি আমাকে মাফ করে দেন বাজান।

তুই বিয়ে করবি না?

না। আমি রোজগার করব। বিয়ে করলে আমার শ্বশুরবাড়ি ঝামেলা করবে। ফিরে এসে বিয়ে করব।

শিউলি জোর দিয়ে বলে, বাজান বিয়েটা দিয়ে দেন।

ও তো ঠিক কথাই বলেছে মা। দু'বছর পরে ফিরে আসবে। তখন বিয়ে দেব। ধুমধাম করেই বিয়ে হবে।

অন্য সবাই চুপ করে বসে থাকে। জয়নুল মিয়া খাওয়া শেষ করে উঠে যায়। কলতলার দিকে চলে গেলে বকুল শিউলির নাকের ডগায় আঙুল উঁচিয়ে বলে, কতটুকু যাওয়া দরকার তা আমি জানি বুবু। কতটুকু গেলে সর্বনাশ হবে তাও আমি জানি। মায়ের কাছে দু'দিন যে থেকে আসলাম, তখন মা আমাকে অনেক কথা বলেছে। খোলাখুলি বলেছে।

চার বোন একসঙ্গে বলে, মা!

বকুল নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে, আমাদের জন্য ভেবে মা রাতের ঘুম হারাম করে। চল, বাসন-কোসন গুছিয়ে ফেলি। তোমরা শুধু শুধু আমার মেজাজ গরম করে দিয়েছ। আমার সঙ্গে কেউ আর লাগতে আসবে না বলে দিলাম কিন্তু।

পদ্ম হাসতে হাসতে বলে, তোমাকে আমরা ফুলের মালা পরিয়ে বিদায় দেব।

হাস্নুহেনা মুখ গম্ভীর রেখেই বলে, তোমার খোঁপায় জরির ফিতা বেঁধে দেব।

শিউলি বেশ শব্দ করেই থালা-বাসন গোছায়। তারপর কয়েকটি থালা নিয়ে বারান্দা থেকে নামতে নামতে বলে, বাকি কাজ তোরা করবি। আমি পারব না। স্কুলের খাতা দেখার কাজ আছে।

প্রত্যেকে অনুভব করে, তাদের সবার বড় বোনটির কণ্ঠস্বর ক্লান্ত। কথায় কথায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আজ ওরা প্রথম অনুভব করে ওদের বড় বোনটি খুব নিঃসঙ্গ। ও যখন বাসন-কোসন হাতে নিয়ে উঠোনে নেমে যায় তখন বকুল বলে, বুবুকে একটা অচিন পাখির মত লাগছে।

অচিন পাখি! হাস্নুহেনার কণ্ঠস্বর গুনগুনিয়ে ওঠে।

চম্পা সায় দেয়, অচিন পাখির মত লাগছে। পাখিটাকে আমরা কোনদিন দেখিনি।

পদ্ম চেঁচিয়ে বলে বলে, বুবু দাঁড়াও।

আচমকা ডাকে শিউলি ঘুরে দাঁড়ালে পদ্ম লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে বলে, বাসন-কোসন আমাকে দাও। আমি ধুয়ে নিয়ে আসি।

আমি কি করব?

তুমি আকাশে উড়তে যাবে।

উড়তে যাব?

তোমাকে আমাদের পাখির মত লাগছে।

ঠিক বলছিস। ডানা ভাঙা পাখি। আমি কেমন করে উড়ব, ডানাতো নেই।

শিউলির দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। বকুল এসে কাছে দাঁড়িয়ে বলে, তোমার চোখে পানি কেন? আমার জন্য তুমি কষ্ট পেয়েছ?

হ্যাঁ। শিউলি আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছে।

কেন? কেন তুমি কষ্ট পেয়েছ শিউলি? তোমাকে এখন থেকে আমি আর বুবু বলব না।

বলিস না।

তোমার কষ্ট কেন, বল?

শিউলি এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, আমার আগে তুই পুরুষ মানুষ ছুঁয়ে দেখলি বকুলি।

কি, কি বললে।

বাকি তিন বোন বিস্ফারিত চোখে বকুলের দিকে তাকায়। বকুল সঙ্গে সঙ্গে আঙুল উঁচু করে বলে, তুমি ঠিক করেছে যে পুরুষ ছুঁয়ে দেখবে না। আমি তো তা ঠিক করিনি। এই তোরা কি বলিস? তোরা কি আমার পক্ষে, নাকি শিউলির পক্ষে?

তিনজন একসঙ্গে বলে, আমরা তোমার পক্ষে। আমরা পুরুষ মানুষ ছুঁয়ে দেখতে চাই।

জয়নুলের চেতন-অচেতনের মাঝখানে অন্ধকার মুছে যেতে থাকে। যেন ওর সামনে রাতের শেষ প্রহর। কলকল শব্দে ছুটে আসে কোন এক নতুন নদী। জয়নুল কুড়িমুড়ি হয়ে শুয়ে থাকে, যেন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যেতে পারলে এ জীবনের পাপমোচন হবে কিন্তু বেশিক্ষণ সেভাবে থাকা হয় না। চিৎ হয়ে গেলে দু'হাত প্রসারিত হয়ে যায়। আমার জীবনে রাশিদুন নাই, মেয়েরা আছে। ও বারান্দায় শুয়ে টুকরো আকাশ দেখতে পায়। তারাভরা আকাশ জ্বলজ্বল করে। মুচড়ে ওঠে বুক।

শিউলি ঘোঁত করে ওঠে। জিজ্ঞেস করে, তোরা পুরুষ মানুষ ছুঁয়ে দেখবি বিয়ের আগে না পরে?

হি-হি করে হাসে তিনজন। চম্পা বলে, প্রেমে পড়লে বিয়ের আগে ছোঁব। আর বিয়ে হয়ে গেলে তো গেলই। তখন তো ছোঁয়াছুঁয়ি ডালভাত।

আবার হাসিতে কলকলিয়ে ওঠে ওরা। বকুল ওদের হাত ধরে বলে, চল ধানের গাদার চারপাশে পাক খাই। দেখবি মানুষের শরীরের গন্ধ ভেসে আসবে।

চার বোন হাত ধরাধরি করে দৌড়ে চলে যায়। শিউলি ভাবে, নিঃসঙ্গ মানুষের নিয়তি ও তো নিজেই বেছে নিয়েছে। তাহলে ওর তো দুঃখ থাকা উচিত না। তবে কেন ও পরাজিত মানুষ হবে? ও বাসন-কোসন নিয়ে কলতলায় যায়। চটপট কাজ শেষ করে। শুনতে পায় বয়াতীর কণ্ঠস্বর। দূর থেকে ভেসে আসছে মন– পাগল মন, মনরে আমার। অচিন পাখির খোঁজে যাসনে কখনো–

শিউলি দু'কান ভরে গান শোনে। গানের কথা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়। যেন বয়াতী বাড়ির চারদিকে ঘুরে ঘুরে গান গাইছে এবং গানটা ওর জন্যই গাইছে। ওর মন ভাল হয়ে যায়। বকুলের সঙ্গে যে কারণে মারামারি করেছে তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে। বুঝতে পারে ছোট বোনেরা কীভাবে বুঝে ওঠার বয়সে পৌঁছে গেছে। ভালই হয়েছে। ওদেরকে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ও পরাজিত মানুষের গানি ভোলে। ভাবে, ওকে তো সেই মেয়ে হতে হয়নি যার মুখে ওর বাবা এসিড ঢালে! চারদিকে তোলপাড় করে বয়াতীর গান– ও মানুষ, মানুষ রে–। শিউলি সেই সুর নিজের গলায় তুলে নিয়ে গুনগুন করে, ও মানুষ– মানুষ রে–। চোখের কোণে কাজল দিয়ে কোন পাখি উড়ে বেড়ায়– আমি জনম কাটাই সেই পাখি হয়ে।

বয়াতী রসিক মানুষ। রাতের খাবার খাওয়ার সময় নানা কথা বলে হাসিয়েছে সবাইকে। মাঝে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলেছে, পক্ষী ছানারা দুঃখের গল্প শোনার জন্য রেডি?

হ্যাঁ, চাচা রেডি।

দুঃখের গল্প শুনতে তোমাদের ভাল লাগবে?

লাগবে চাচা। গল্পটাতো আমাদের মায়েরও গল্প। মায়ের কথা শুনতে আমরা সবচেয়ে বেশি ভালবাসি।

আচ্ছা, আচ্ছা বুঝেছি। মায়ের পাতুড়ি খেয়ে মজা লাগল। শিউলি মা আমার যেমন মাস্টারনি, তেমন রাঁধুনি।

শিউলি এমন প্রশংসায় গা করে না। আর একদিকে তাকায়। বয়াতীর ঘাড়ে হাত রেখে জয়নুল বলে, আমার শিউলি মাইতো সংসার দেখাশোনা করে। এখন তুমি ওদের মায়ের কথা বল বয়াতী।

বয়াতী গলা ঝেড়ে নিয়ে প্রথমে সুর ধরে– বলি বলি বলে যাই তাহাদের কথা– যাহাদের মানবজীবন পাখিদের মতন– কত চাঁদ কত তারা–

এটুকু গেয়ে বয়াতী দোতারা বাজায়। থামে, শুরু করে কথা– তারপর একদিন পথের ধারে দেখা হল ভাবীজানের সঙ্গে। দেখলাম মুখ কালো। কপালে কুঞ্চন রেখা। বলি, ভাবীজান মন খারাপ কেন আপনার? ভাবীজান কথা না বলে চোখ মোছে। বলে, নিজের হাতে যে মেয়েটিকে প্রসব করিয়েছিলাম সেই মেয়ের বাপ মেয়েটিকে এসিড দিয়ে পোড়ায়। হাতে-পায়ে এসিড লাগায়। পায়ের আঙুলে এমন করে এসিড লাগিয়েছে যে আঙুল পুড়ে জোড়া লেগে গেছে।

আহারে–। আমি দুঃখ ধরে রাখতে পারি না। কিন্তু ফল হয় উল্টো। ভাবী চোখ গরম করে বলেন, নিজের পথে যান। আর কখনো আমাকে মুখ দেখাবেন না।

আমি বলি, আমি কি করলাম? আমার কি দোষ ভাবীজান?

আপনার কোন দোষ নাই। বাড়ি গিয়ে আপনার বন্ধুকে বলবেন আমি খুব ভাল আছি। ভাবী আর দাঁড়ায় না। আলপথে নেমে যায়। আমি দাঁড়িয়ে থাকি, দাঁড়িয়েই থাকি। তারপর খুশি হই এই ভেবে যে ভাবীজান আমাকে আমার বন্ধুর কাছে খবর পৌঁছাতে বলেছে।

বয়াতীর কথা শুনে মেয়েরা একে-দুয়ে উঠে যায়। কেউ কোন প্রশ্ন করে না। শুধু জয়নুল বলে, মেয়েটা বাঁচবে তো?

ওকে নিয়েই তো ডাক্তারের কাছে দৌড়াদৌড়ি করছে ভাবীজান।

রাত বাড়ে। ঘরের দাওয়ায় একা বসে থাকে জয়নুল। মেয়েরা নিজেদের ঘরে ঘুমিয়ে গেছে।

রাত বাড়ে।

জয়নুলের চোখে ঘুম নেই। বুকের ভেতরে শনশন শব্দ। ও কিছু একটা ধরার জন্য হাত বাড়ায় কিন্তু কাছে কিছু নেই। ঘরের খুঁটিটা হাতের লাগালের বাইরে। বাড়ানো হাত শূন্য হাতড়িয়ে নিজের কাছে ফিরে আসে।

রাত বাড়ে।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে ঘিরে আছে বাড়ি। জয়নুল সময়ের কাছে নতজানু হয়। সময় তার বুকে হাহাকার তোলে। নিজেকে বলে, আমার মরণ দাও মাবুদ।

মুহূর্তে চমকে ওঠে ও। চড়চড় শব্দ চারদিক তোলপাড় করে। মাথা ঝুঁকে পড়ে বুকের ওপর। বুঝতে পারে মাথা তুলতে পারছে না। শরীর নুয়ে আসছে। গড়িয়ে পড়ে বারান্দায় বিছানো মাদুরের ওপর। অচেতন হওয়ার আগে শুনতে পায় রাশিদুনের রাগত কণ্ঠস্বর।

ছেলে ছেলে কর, গরিব মানুষের আবার বংশ কি! রাত পোহালে দিন শেষ। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় যার তার আবার বংশ রক্ষা। ফুঃ। থাকে শুধু মরে গেলে তিন হাত মাটি।

জয়নুল বিড়বিড় করে বলে, শিউলির মা তুমি আমারে মাফ করে দাও।

মাফ? সেটা আবার কি! অপরাধ, অপরাধই। তার আবার মাফ।

জয়নুলের চেতন-অচেতনের মাঝখানে অন্ধকার মুছে যেতে থাকে। যেন ওর সামনে রাতের শেষ প্রহর। কলকল শব্দে ছুটে আসে কোন এক নতুন নদী। জয়নুল কুড়িমুড়ি হয়ে শুয়ে থাকে, যেন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যেতে পারলে এ জীবনের পাপমোচন হবে কিন্তু বেশিক্ষণ সেভাবে থাকা হয় না। চিৎ হয়ে গেলে দু'হাত প্রসারিত হয়ে যায়। আমার জীবনে রাশিদুন নাই, মেয়েরা আছে। ও বারান্দায় শুয়ে টুকরো আকাশ দেখতে পায়। তারাভরা আকাশ জ্বলজ্বল করে। মুচড়ে ওঠে বুক। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, চারপাশে এতকিছু থাকার পরও আমার মত একলা মানুষ কেউ নাই। কান্না থামাতে পারে না জয়নুল। বুক উজাড় করে কেঁদে আকুল হয়ে বলে, আমি তো আর আনন্দে নাই। এখন দুঃখই আমার আকাশের তারা। রাশিদুন তুমি ভাল থাক।

কোথাও কোন শব্দ নাই। স্তব্ধ নীরবতায় পুরো গ্রাম অন্ধকারে ঢেকে আছে। সেই অন্ধকারে শুধুই কান্নার শব্দ নতুন নদীর মত বয়ে যায়। জয়নুল নিঃসঙ্গতার নদীতে ক্রমাগত তলাতে থাকে।

• পরবর্তী সংখ্যায়

সেলিনা হোসেন কথাসাহিত্যিক

প্রবন্ধ

পয়লা বৈশাখ নববর্ষ ও রবীন্দ্রনাথ

অপূর্ব কর

এ রকম একটি প্রশ্ন দিয়েই মনে হয় লেখাটার সূচনা হওয়া ভাল– রবীন্দ্রনাথ কী বাংলা নববর্ষ বা ১লা বৈশাখ পালন করতেন? দিনটির কী কোন গুরুত্ব ছিল তাঁর কাছেঃ

উত্তর– হ্যাঁ। রবীন্দ্র জীবনীকারদের লেখা থেকে জানা যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমারী মহলানবীশ, বিশেষত নির্মলকুমারী মহলানবীশ উল্লেখ করেছেন– 'নববর্ষ ৭ই পৌষ, ১১ই মাঘ, বর্ষশেষ, ২৫শে বৈশাখ এই রকম এক একটি উৎসবের দিনগুলির কত মূল্য ছিল কবির কাছে, যাঁরা কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরা সকলেই জানেন। কিন্তু বাইরের সকলের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে খুব সংকোচ ছিল।' (*বাইশে শ্রাবণ*, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৩) উপরোক্ত জানানি থেকে অনেকগুলি বিষয় উঠে আসে– রবীন্দ্রজীবনে কি কি তাৎপর্যময় দিন, কোনগুলি তাঁর কাছে উৎসবের মাত্রা পাওয়া দিন, ব্যক্তিগত অনুভবের গাঢ় মহিমা কোন দিনগুলিতে জড়িত, প্রয়োজন না হলে তার গুরুত্ব তিনি যত্রতত্র প্রকাশ করতে সংকোচশীল। নির্মলকুমারী মহলানবীশের রচনাতেই পরে আছে যে দিনগুলির সঙ্গে ধর্মসাধনার ভাবনা জড়িত– যাদের কাছে স্লেস বের গুরুত্ব আছে সেখানে তিনি প্রকাশশীল হতেন। উপরোক্ত দিনগুলিতে তা কমবেশি আছেই।

এ দিনগুলির পালনকে কেন্দ্র করে কিছু আনুষ্ঠানিকতাও অঙ্গাঙ্গী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দিনগুলিতে যুক্ত করতেন উৎসবসয়তা, উৎসবী ভাব। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রতিদিন দৈনন্দিনতার খাঁচায় মানুষ ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ, একা, কিন্তু উৎসবের দিনে সে ব্যাপ্ত, উদার, বিশাল। তুচ্ছতার গ্লানি থেকে তার উত্তরণ। আবার উৎসব মানে রবীন্দ্রবিশ্বাসে একদিকে জাঁকজমক, আড়ম্বর অন্যদিকে কোথাও বা কারো অব্যক্ত বেদনা। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে সে উৎসব পালন ব্যর্থ। এ বিষয়ে তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা আছে।

বাংলা নববর্ষ বা বর্ষশেষ পালনে পরিচয় ফুটে ওঠে অন্য রবীন্দ্ররূপের। তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদী, ব্রাহ্মকৃষ্টির মানুষ হয়েও নববর্ষ বা বর্ষশেষ পালনে বাঙালিয়ানার বিশুদ্ধ অনুসরণকারী। দিনগুলির সঙ্গে বাঙালির জাতিসত্তার ঐতিহ্য, বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রোথিত যে গভীর শিকড় তা তিনি অনুভব করেছিলেন। মনন পরশে তিনি এ বঙ্গচেতনাকে আশ্চর্য ঋদ্ধ করেছিলেন, নিহিত মহিমাকে দিয়েছিলেণ উদার, অনন্য সৌন্দর্যময়তার রূপ। বাঙালির মনন, চৈতন্য, জীবনশৈলীতে এই বৈশিষ্ট্যের নামই রাবীন্দ্রিকতা। বাংলা নববর্ষ দিনটি তাতে শুভময় হয়েছে, উদারতা পেয়েছে মঙ্গল চিন্তার দ্যেতনাবহ হয়েছে। রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের মহিমা যুক্ত না হলে বা তাতে রবীন্দ্র জীবনদর্শন সম্পৃক্ত না হলে এটা হয়তো হয়ে থাকত নিছক একটা পুজোপালির দিন বা এজাতীয় কিছু। বর্ষশেষ পালনে বাংলার নানা অঞ্চলে গাজন, চড়ক, গম্ভীরা, শিব্রনাচ, নীলপূজা, সং এগুলির নিহিত লোকসংস্কৃতি, লোকজ ভাবনা, বর্ষবরণে নানা স্থানীয় লোকাচার, সংস্কৃতিময়তা পেত না গূঢ় তাৎপর্য বা দিশা, জাতীয় বৈশিষ্ট্য, যা রবীন্দ্রনাথ আমাদের উপহার দিয়েছেন। দিয়েছেন এ উৎসবগুলির তাৎপর্যের ব্যাপ্তি। এসব তাঁর গানেকবিতায়প-বন্ধেনাট কে অন্য অভিব্যক্তি নিয়ে প্রকাশত হয়েছে। আদতে তো বর্ষশেষ বা নূতন বছর, নববর্ষ পৃথিবীর সৌর পরিক্রমাসঞ্জাত নেহাতই প্রাকৃতিক ঘটনা। মানবমনে ও জীবনে তার অমোঘ প্রভাব। মানুষ তাতে প্রয়োজনের অপ্রয়োজনের বিচিত্র রঙ লাগিয়েছে। সৃষ্টি রহস্যের দ্যোতনায় তাকে দেখেছে। একাত্ম হয়ে বিশ্ব সাথে গড়তে চেয়েছে মহাযোগ। রবীন্দ্রনাথ তাতে অন্য মাত্রা, অন্য উন্মোচন যোগ করেছিলেন যা রবীন্দ্রভাবনায় জড়িত হয়ে ঢুকে গিয়েছিল রবীন্দ্রদর্শনের উদার আঙিনায়, এক অনন্য ভাবলোকে।

বর্ষবরণ বা ১লা বৈশাখ রবীন্দ্রজীবনে যেভাবে রেখাপাত করেছিল তার পেছনে অবশ্য অন্য ঘটনা আছে। এই প্রসঙ্গে বাংলার ১লা বৈশাখের ইতিহাসকে একটু ঘাঁটতে হয়। তাতে বাংলার অর্থনৈতিকতার মূল ভিত্তি কৃষির একটা বিশেষ দিক প্রকাশিত। রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়টি গভীরভাবে সম্পৃক্ত। বিশদে না গিয়েও যা বলার, কৃষককে রাজা, জমিদার, চূড়ান্ত ভূমিপতিকে রাজস্ব দিতে হয়। মোগল আমলে এই রাজস্ব সংগ্রহ চলত যে অর্থনৈতিক বছরের হিসেব ধরে তা হত হিজরি কালপঞ্জি মেনে– যা চান্দ্রমাসের হিসাবে গণনানির্ভর। কিন্তু ফসলের উৎপাদন এই কালপঞ্জিতে মেলে না। ফলে খাজনা আদায়ে বিস্তর অসুবিধা হত। সম্রাট আকবর এই সমস্যা নিরসনে অগ্রসব হলেন। জ্যোতির্বিদ ফতেউল্লা সিরাজি হিজরি সন এবং হিন্দু সৌরমাস ধরে তৈরি করলেন নতুন কালপঞ্জি– তাতে চৈত্র হল বছরের শেষ মাস ও বৈশাখ প্রথম। ১৫৬৩ (১৯৯ হিজরি সন) থেকে আকবর এর প্রবর্তন করলেন। এই কালপঞ্জির পরিমার্জিত রূপ বাংলায়, ত্রিপুরায় বঙ্গাব্দ। অসমে ভাস্করাব্দ। অর্থনৈতিক লেনদেনে ১লা বৈশাখ গুরুত্ব পেল। চালু হল হালখাতা (হাল আরবি শব্দ, খাতা ফারসি)। হালখাতার সঙ্গে আবার খাজনা উসুলের ব্যাপার জড়িয়ে গেল। ইংরেজ আমলে দেশীয় ব্যবসা– বাণিজ্যে খেরোর খাতা বা লাল শালু বাঁধানো খাতায় সৎবৎসরের জমাউসু লের হিসাব রাখা শুরু হল। রাজস্ব আদায়ে আবার বছরের প্রথম দিন ঘোষিত হল পুণ্যাহের দিন। পুণ্য অহ, পুণ্য কাজ শুরু করার জ্যোতিষ শাস্ত্রানুমোদিত প্রশস্ত দিন, জমিদাররা এদিন থেকেই খাজনা আদায় শুরু করতেন। প্রজারা জমিদার বাড়ি, বা জমিদার সকালে সেজেগুজে খাজনা নিতে হাজির হতেন। দিনটিকে নানা মাঙ্গলিকতার অনুষ্ঠানে মোড়ার আয়োজন হত। প্রজাদের। মাণ্ডামিঠাইশরবত দি য়ে আপ্যায়ন করা হত। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদার, প্রজারা পুণ্যাহের দিনে যে যা কিছু পারে এসে দিয়ে যাচ্ছেন কর্তামশাইকে। কবির মুখে স্মিত হাস্য। একটা উৎসবী পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এভাবেই প্রথম ১লা বৈশাখের পরিচয়। মূলে অর্থনীতি, আবার মাঙ্গলিকতা, সম্প্রীতি।

পরে যুক্ত হয়েছে ঈশ্বর বিশ্বাস, লোকাচার, কত কিছু। ১লা বৈশাখে সিদ্ধিদাতা গণেশের আরাধনা। তাকে স্মরণ করে নতুন বছরের সূচনায় লেখা বা উচ্চারিত হচ্ছে 'নমঃ গণেশায়', মুসলমান আল্লাহকে স্মরণ করে কাজ কারবারের সূচনায় লিখছেন 'এলাহি ভরসা', বৌদ্ধরা 'বুদ্ধং শরফ্‌ গচ্ছামি', খ্রিস্টান খাতায় আঁকেন 'ক্রুশ চিহ্ন'। আবার সাংস্কৃতিকতার দিকও আছে, বৈশাখ বছরের প্রথম মাস। নববর্ষের সূচনা, পুরনো বিদায়। প্রকৃতিতেও নতুন বার্তা। জীর্ণ বসন ছেড়ে একদিন যেন সবকিছুর নতুন বসন পরার আকুতি। উদ্বেল দেহমনমনন। শিখরা পালন ক রেন 'বৈশাখি', অসমে বৈশাখ 'রঙ্গিলা বিহুর মাস', তামিলনাড়ুতে 'পূতাণ্ডু', কেরলে 'পুরম ভিশু', ত্রিপুরায় 'বৈশুক', মারমারা পালন করেন 'সাংগ্রাই', চাকমারা 'বিজু', পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলার জেলায় জেলায় বর্ষশেষ, সংক্রান্তি, নববর্ষ, ১লা বৈশাখ মানে মানুষের কত সৃজন ও মনন প্রকাশের বন্যা। জীবনের শুরুতে এক আবহে, প্রকৃতির এক ভিন্ন পটভূমিতে দেকা নববর্ষ, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রজীবনে বিশেষত শান্তিনিকেতনে গভীর ঋদ্ধ রূপ নিয়ে মূর্ত হয়েছিল। সঞ্জাত হয়েছিল তার সঙ্গে তাঁর জন্মমাসের প্রেক্ষিতেরও অনুভব। মাস বৈশাখ তাঁর চেতনায় কতভাবে কথা বলা।

রবীন্দ্রনাথ দেশীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করে পয়লা বৈশাখে আরেকটি জিনিসের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন– শুভ দিন গণ্য করে যে কোন কল্যাণকর কাজের বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা বা উদ্বোধনের সূচনা বছরের প্রথম দিনটিতে করতেন। এরকম কয়েকটি উদাহরণ– ১৩১৮র বর্ষশেষের শেষ দিনটিতে কবি শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতনে পৌছলেণ, ১৩১৯এর প্রাতে নববর্ষের দিন মন্দিরে উপাসনা করলেন। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়কে ইউরোপের কাছে পরিচিত করানো ও তাঁর নিজের শারীরিক চিকিৎসা করানোর জন্য বিলাত যাত্রা আসন্ন। ১৯১৪র বৈশাখে প্রমথ চৌধুরীর *সবুজ পত্র* বেরুল, নববর্ষের দিন সুরুলের কুঠিবাড়িতে গৃহপ্রবেশ, একরকম শ্রীনিকেতনের সূচনা। *সবুজ পত্রের* শুভেচ্ছায় এসময়কার তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'সবুজের অভিযান'। ১৩৩০এর নবব র্ষের দিন রতন্নকুঠির ভি ত্তি স্থাপিত হল। পঁচিশ হাজার টাকা দিলেন স্যার রতন টাটা। ১৩৩৩এ বাংলা নবব র্ষের দিন শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীদের উদ্যোগে কবির কন্মোৎসব পালনের আয়োজন। লেখা হল পূজারিণীর নাট্যরূপ *নটীর পূজা*। কলকাতায় তখন দাঙ্গা। কবি হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীর রূপ দেখে স্মরণ করলেন প্রেম, অহিংসা, করুণার বাণী। লেখা হল নানা প্রবন্ধ। বিখ্যাত 'ধর্মমোহ' কবিতাটি এসময়ই লেখা। ১৩৩৪এও আহ মেদাবাদ থেকে আগ্র হয়ে ফিরে শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ ও নববর্ষের অনুষ্ঠান। *নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা* গীতিনাট্য রচনার সূচনা। বর্ষশেষ ও নববর্ষ পালনের চিন্তায় এখন গাঢ় রবীন্দ্রদর্শন। ১৩৩৮এ শা ন্তিনিকেতনে ছাত্রদের সামনে রবীন্দ্রনাথের নববর্ষের পটভূমিকায় বিখ্যাত ভাষণ– যা রচিত হয়েছিল বহু আগে, ১৩০৯ সালের ১লা বৈশাখ। যার মূল কথা কবিরই অন্য এক কবিতায় বললে দাঁড়ায় এই– 'নতুন সে পলে পলে অতীতে বিলীন,/ যুগে যুগে বর্তমান সেই তো নবীন।' তিনি ঐ ভাষণে ইউরোপীয় সভ্যতার মর্মবাণীর সঙ্গে অমর ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপের পার্থক্যটি তুলে ধরেছিলেন, বলেছিলেন– 'আজ পুরাতনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম কারণ পুরাতনই চিরনবীনতার অক্ষয় ভাণ্ডার।' তিনি কামনা করলেন 'যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাস তাহারই জয় হইবে।' তিনি ভারতবর্ষের সত্য স্বরূপটিকে অনুধাবন করতে আধুনিক ভারতকে

ডাক দিলেন।

এর রেশ চলেছে কবির শেষ 'নববর্ষ' পালনের অনুষ্ঠান পর্যন্ত। ১৩৪৮এর ১লা বৈশাখ কবির সুবিখ্যাত *জন্মদিনে* কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত। জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ। আগের বছর এই দিনে রচিত বিখ্যাত গান 'ঐ মহামানব আসে...' ১৩৪৮এর শেষ অনুষ্ঠানেও গীত হয়। জন্মদিনের সর্বশেষ ভাষণ 'সভ্যতার সঙ্কট' সেদিন পঠিত হল। কোথা থেকে কোথায় ছাড়িয়ে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। একদিন পুণ্যাহ, নববর্ষের দিনে ঢাক্না ঢোল সানাই, তারপর 'এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার' এই অনুভূতিমালা থেকে

'এসো গো নতুন জীবন।
এসো গো কঠোর নিঠুর নীরব, এসো গো ভীষণ শোভন।
এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত, এসো অশ্রুসলিল সিক্ত
এসো গো ভূষণবিহীন রিক্ত, এসো গো চিত্তপাবন।
থাক বীণাবেণু, মালতী মালিকা, পূর্ণিমা নিশি, মায়া কুহেলিকা
এসো গো প্রখর হোমানল শিখা হৃদয় শোণিত প্রাশন।
এসো গো পরম দুঃখ নিলয়, আশা আঙ্কুর করহ বিলয়–
এসো সংগ্রাম, এসো মহাজয়, এসো গো মরণ সাধন।

মাঝে 'নববর্ষে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা থেকে...' জীবনের শেষবেলায় মহাযুদ্ধে আক্রান্ত মানবসভ্যতায় সভ্যতার অস্তিত্ব নিয়ে উদ্বেগের পাশাপাশি কবি ডাক দিলেন অন্য প্রত্যয়ের–

'নববর্ষ এল আজি দুর্যোগের ঘন অন্ধকারে
আনে নি আশার বাণী
দেবে না সে করুণ প্রশয়।
প্রতিকূল ভাগ্য আসে হিংস্র বিভীষিকার আকারে;
তখনি সে অকল্যাণ যখনি তাহারে করি ভয়।
যে জীবন বহিয়াছিল পূর্ণ মূল্যে আজি হোক কেনা;
দুর্দিনে নির্ভীক বীর্যে শোধ করি তার শেষ দেনা।'

প্রতি নববর্ষে নবজন্ম পুরাতনের সঙ্গে সম্পর্কিত থেকেও নতুন যাত্রায় উত্তরণের জন্য আকুতি। সূর্য প্রদক্ষিণে পৃথিবীর বার্ষিক গতি সম্পন্ন হওয়ার প্রচলিত গ্রহ্য দিন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাবলেন কত ভাবনা। একটা নিছক দিনকে হৃদয়ে গ্রহণ করলেন, করালেন কী অনিন্দ্য উপলব্ধির সুগভীর মাত্রা দিয়ে। পৃথিবীতে সব দেশে নববর্ষ বরণ, একেক গণনা, ব্যবহারিক জীবনধারার হিসাব কর্ষে চলার পরিকল্পনা। রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগ করলেন এমন কিছু যেন মরা ডালে ছড়িয়ে দিলেন সুরের আগুন। সকলে ঠিকভাবে ভাবলে বলবে– হ্যাঁ, তাই তো, নববর্ষের প্রথম দিনটির মধ্যে এত না বলা বাণী।

বঙ্গাব্দ নিয়ে নানা কারণে এখন আমরা প্রায় সরে যাওয়া। আমরা ইংরেজি ক্যালেন্ডারের হিসাবমোতাবেক চলি। তবু গ্রামবাংলা, সব খুইয়েও এখনো যে রক্তে বা শিকড়ে বাঙালিত্ব, পয়লা বৈশাখ এলে চঞ্চল হই। কান পাতলে শোনা যায় চৈত্র বিদায়, হৃদয়ে কী যেন একটা হাওয়া বাইছে। একটু হলেও আন্দোলিত চারদিক– মানবমন, মানুষজন। প্রকৃতিও তাতে আড়ালে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়। এই বর্ষশেষের সব অনুভব লগ্নতা, অন্তরের, বাইরের আয়োজন নিয়েও রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য রচনা। বর্ষশেষ ও নববর্ষ আসলে তাঁর কাছে এক অখণ্ড চেতনায় বাঁধা– তাতে অবগাহন যেমন রবীন্দ্রনাথকে আরো ভালভাবে চেনা, বাঙালিরও জাতীয় পরিচয়ের নিবিড় উদঘাটন।

অপূর্ব কর ভারতে কবি, প্রাবন্ধিক

ভারত সম্পর্কে নিয়মিত জানতে লাইক ও ভিজিট করুন আমাদের page: High Commission of India, Dhaka

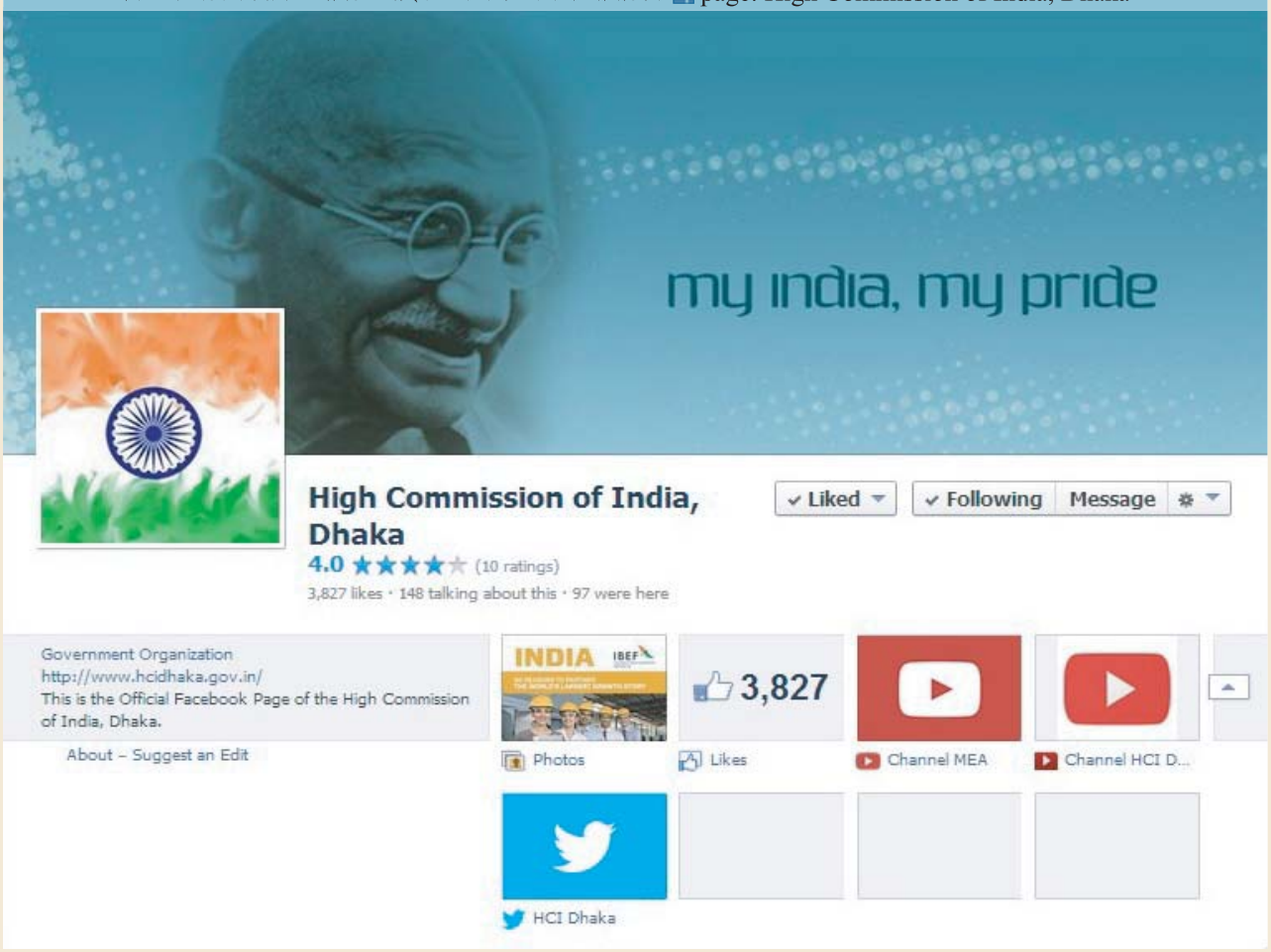

Standard Chartered

When businesses succeed, livelihoods flourish.

In 2009, we took the initiative to be first to align with the World Bank Group in boosting global trade flows. Since then, we have continued to be proactive in encouraging growth across our markets. As trade is the lifeblood of the local economy, our commitment does more than protect businesses. It stimulates the communities that depend on them.

Here for good

Discover more at
standardchartered.com/answers

ছোটগল্প

খেলা ভাঙার খেলা

শ্যামল দত্তচৌধুরী

রন্নষার চোখ নমিত, তার লাবণ্যহীন শরীরভঙ্গি যেন আরও ঋজু। রন্নষা বলল, 'আই লাভ ইউ বৈভবী।' বৈভবী চমকে উঠেছিল। প্রথমে কিছু বুঝতেই পারেনি। তারপর বলেছিল– 'অ্যাঁ, কী বলছিস তুই!'

রন্নষা নিরন্নত্তর। বরাবরই সে যেন একটু আলাদা। লম্বা। পোশাক উলোঝুলো মার্কা। জিনস আর ঝুলঝুলে বাটিকের পাঞ্জাবি, গলায় স্কার্ফ বাঁধে। বৈভবীর বেস্ট ফ্রেন্ড।

বৈভবীর বাবা এখন হায়দ্রাবাদে পোস্টেড। এক বিশাল তেল কোম্পানির মার্কেটিং বিভাগের আধিকারিক। পদস্থ অফিসার, তেমনই তার ঠাটবাট। তিন-চার বছর পরপরই তাকে বদলি হয়ে যেতে হয়। ডিস্ট্রিবিউটার-ডিলার নেটওয়ার্ক থেকে পকেট উপচানো উপরি আয়। বৈভবীর মা স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরেন। ইনি অবশ্য ওর দ্বিতীয় বাবা। বৈভবীর বাপি নাম্বার টু।

বৈভবীর আট বছর বয়সে ওর আসল বাবা ওদের ত্যাগ করে অন্য এক মহিলাকে নিয়ে কলম্বোতে বাস করতে চলে গিয়েছিল। বৈভবীরা তখন দিলিম্নতে দাদুর বাড়িতে চলে এসেছিল। সে বাড়ির একতলাটা ছিল তেল কোম্পানির লিজে, ট্রানজিট ফ্ল্যাট হিসেবে ব্যবহৃত হত। কোম্পানির বড় অফিসাররা কিছু দিন এখানে থাকে, তারপর চলে যায় কর্মস্থলে।

এখানেই বৈভবীর মার পরিচয় বাপি নাম্বার টুর স ঙ্গে। ইম্‌ফলের কর্মস্থলে যাওয়ার সময় বাপি নাম্বার টু বৈভবীর মাকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। সঙ্গে দুটো সুটকেস আর বৈভবী।

একটা বয়সের পরে ঘুরে ঘুরে পড়াশোনা চালানো যায় না। অবশেষে কলকাতার এক কলেজে ভর্তি হয়ে বৈভবী স্থিতিলাভ করেছিল। বাপি নাম্বার টুর পরিচিত এক ট্যাংকার মালিক জয়সোয়াল আঙ্কেলের লাউডন স্ট্রিটের ফ্ল্যাটটা বছরভর শূন্য পড়ে থাকে। জয়সোয়াল আঙ্কেল খুব খাতির করে বাপি নাম্বার টু-কে। ফ্লাটটা ছেড়ে দিয়েছে তার মেয়ের সেবায়। বৈভবীর নামে কাছের ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছে। একবার মা তার স্বামীর সঙ্গে এসে ক'দিন থেকে বৈভবীর ঘরদোর গুছিয়ে দিয়ে গেছে। ঘরের কাজ, রান্নার জন্য একজন মাসি– পার্টটাইম। বৈভবীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সর্বদা পরিপুষ্ট থাকে। একমাত্র মেয়ের বিন্দুমাত্র অসুবিধে হতে দেবে না মা।

জয়সোয়াল আঙ্কেলের স্ত্রী কমলা আন্টি প্রথমদিকে রাত্তির বেলা রোজ ফোন করে বৈভবীর খবর নিতেন। উইক এন্ডে ওঁর কাছে গিয়ে থাকতে বলতেন। বৈভবী বলত, পরে জানাবে। আর জানায়নি। বেশি রাতে হায়দ্রাবাদ থেকে মা'র ফোন আসত। একঘেয়ে কথা। তারপর ঘুমিয়ে পড়ত বৈভবী। দারুন স্বাধীন, মুক্ত, তৃপ্তির ঘুম ঘুমোত সে।

বলা যায় ওর জীবনে একটাই প্যাশন– শপিং। কলেজ থেকে দুপুরে তার রোজই বেরিয়ে পড়া চাই। সাধারণত রুষাই থাকে সঙ্গে। মাল্টিপেক্স, ফুড পান্ডা, শপিং মল চষে বেড়ায় দু'জনে। সিনেমা দেখে, খেয়ে, ঘুরে, ডিজাইনার পোশাক এবং ট্রাইবাল কাঁধ আর গালার গয়না কিনে কিনে বৈভবীর আনন্দে দিন কাটে। ফ্ল্যাট ভরে ওঠে জিনিসে। রুষা কলেজে যাওয়াআসা ক রে সেই রিষড়া থেকে। একদিন বৈভবী ওর সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে রুষার মাবাবা কে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ওকে নিয়ে আসে তার লাউডন স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে। বেশ মজা করে দুই বন্ধুর দিন কাটছিল, একদিন ছন্দপতন হল। রুষা বলে ফেলল, 'আই লাভ ইউ বৈভবী।'

বৈভবী বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল। একটু সামলে নিয়ে বলল, তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, আমিও তোকে ভালবাসি তো! কিন্তু রুষা অন্য কিছু বোঝাতে চায় মনে হয়েছিল বৈভবীর। ইতোমধ্যে ক'জন বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ওর মাখামাখি হয়ে গেছে। অন্য কোনও মেয়ের বয়ফ্রেন্ড ভাঙিয়ে নিতে ওর দারুন উৎসাহ। তারপর ছেলেটা ওর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে এলে তাকে ত্যাগ করে বৈভবী অন্য কারও বয়ফ্রেন্ডের দিকে নজর দেবে। বোধহয় প্রেম নয়, ওই আয়ত্তে আনার খেলাটাতেই ওর আগ্রহ বেশি। আজ বৈভবী এক বিচিত্র প্রেমের মুখোমুখি হয়ে বেজায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

রুষা খুব দ্রুত কথা বলছে, যেন বেশ অনেক দিন ধরে ভেবে রাখা ছিল 'তুই রাগ করলি বৈভবী? আমি আর মনের ভেতরে চেপে রাখতে পারছি না রে। সেই কবে থেকে তোকে ভালবাসি। ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে তোকে দেবার জন্য লাভ ইউ কার্ড কিনেছিলাম, কিন্তু তুই শমিতের সঙ্গে নাইট ক্লাবে গেলি বলে রাগ করে দিইনি। আই লাভ ইউ বৈভবী, আই লাভ ইউ–'

'চুপ কর রুষা, পিজ চুপ কর। তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! আমি বেরচ্ছি, শমিত আমাকে তুলতে আসছে।'

'এই তোর প্রবলেম বৈভবী, আজ শমিত কাল অন্য একজন। কোনও মেয়ের হ্যান্ডসাম বয়ফ্রেন্ড দেখলেই তোর কেড়ে নেওয়া চাই। এটা একরকম সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার, তুই জানিস? কলেজে তুইই সব চেয়ে আনপপুলার মেয়ে। শ্রীতমা অভিষিক্তা দেবকী তোকে কী মাত্রায় হেট করে তুই ভাবতে পারবি না।'

বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি সাজগোজ করছিল বৈভবী। মেঘালয়ের র‍্যাপ অন, হাতকাটা স্প্রি গোছের টপ। গলায় দু'তিন ছড়া পুঁতির মালা, অক্সিডাইজড ধাতুর ওপর লাল পুঁতি বসানো ঝোলা দুল। লাল রঙ কাঠের মোটা বালা দু'হাতে ঢলঢল করছে, হাতে একগাদা রাজস্থানি চুড়ি। প্ল্যাটফর্ম চপ্পল পায়ে গলিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো এলোমেলো করে নিল বৈভবী। ফুললেঙথ আয়নার প্রতিবিম্বে রুষার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কে আমাকে হেট করছে কে আমাকে ভালবাসছে, ওসব ভাবার আমার সময় নেই রে। আই কুডন'ট কেয়ার লেস। ফিরতে রাত হবে–'

ঘর থেকে বেরতে গিয়ে কী মনে হতে বৈভবী বলল, 'তুই যাবি? একলা ফ্ল্যাটে বসে থাকলে তোর মাথা আরও খারাপ হবে। শমিত ওন্ট মাইন্ড–'

'আবার শমিত! এই ক'দিন আগে তুই কিঙ্করের সঙ্গে তন্ত্রে গেলি না? উঃ বৈভবী ইউ আর সিক। তোর মা জানলে কী ভাববে?'

'তুই কি আমার মরাল গার্জিয়ান হলি রে রুষা? মাবাবাই আমার জীবনে ইন্টারফিয়ার করে না, তো তুই কে হরিদাসী পাল! মাবাবার লাইফ নিজেদের, তেমনি আমার লাইফ আমার নিজের। আমাকে ওরা মেইনটেন করছে, ব্যাঙ্ক রোল করছে– সেটা ওদের কর্তব্য, ওদের ডিউটি। বদলে ওরা আমার থেকে মোটেই আনুগত্য, ভালবাসা আশা করে না। ওসব আগের সেঞ্চুরির সেন্টিমেন্ট পচে গেছে। দিস ইজ মাই লাইফ। আমার জীবন কীভাবে কাটাব, কার সঙ্গে কোথায় যাব, কার সঙ্গে শোব তা পুরোপুরি আমার নিজস্ব ব্যাপার। তুই যাবি? যাবি না! দেন রট ইন হেল...'

দিনদু'য়েক পরে বৈভবী বলেছিল, 'কিছু মনে করিস না রুষা, এক বিছানায় পাশাপাশি শুতে আজকাল আমার অস্বস্তি হচ্ছে রে। পাশের গেস্টরুমটা তো খালি পড়েই আছে, তুই ও ঘরটায় যা–' সঙ্গে সঙ্গে রুষার দু'চোখে জল। বলল, 'আমি থাকব না এখানে, আমি বাড়িতে ফিরে যাব। শেষে তুই আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিস!'

রুষা কিছুদিন ক্লাসে আসছে না। মেলবক্স খুলে বৈভবী দেখল লম্বা এক প্রেমপত্র এসে হাজির। প্রিকমপিউটার যু গের চিঠি হলে নিশ্চয় হালকা গোলাপি লেটারপ্যাডের কাগজে পারফিউমসুরভিত হ য়ে আসত। রুষার মেল। পুরোটা পড়ার ধৈর্য বৈভবীর নেই, কিন্তু রুষার মনের প্রবল আশান্তি আর হতাশা প্রথম কয়েক লাইনেই বেশ ফুটে উঠেছে। ভাসা ভাসা আত্মহত্যার ভাবনাও আছে।

রাতে চ্যাটবক্স খুলতেই রুষার মেসেজ আসতে লাগল। ছুটিতে রন্নষা যখন বাড়ি যেত, তখন এই বিশেষ সময়ে ওরা দু'জনে এইভাবে আড্ডা মারত।

'তুই কি আছিস বৈভবী? আজ ওয়ান্ট টু চ্যাট।'

'বল রুষা'।

'বৈভবী, উঃ বৈভবী, তোকে ছেড়ে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে রে। আই লাভ ইউ লাইক ম্যাড–'

'ইউ আর ম্যাড। এখনও তোর পাগলামি সারেনি?'

'কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছিস বৈভবী? সব সময় কেবল তোর কথা ভাবি, ভীষণ মিস করি তোকে। তুইও আমা কে মনে মনে ভালবাসিস, সত্যি কী না বল? কত দামী দামী গিফট দিস আমাকে। আমরা একসাথে কেমন মজা করি সারা দিন। এখন যদি বলিস, আমাকে ভালবাসিস না, আমি বিশ্বাস করি কী করে?'

'রুষা ডোন্ট গেট মি রং। তোর একজন সাইকায়াট্রিস্ট দরকার যে তোকে কাউন্সেলিং করবে। আমি না হয় ফিজ দেব–'

'এই তো বৈভবী, তুই আমার জন্য কত চিন্তা করিস, তবে! ইউ ডু লাভ মি, ডোন্ট ইউ?'

'আমি এখন বেরব! আয়াম সাইনিং অফ–'

'এখন? তোকে বাড়িতে ড্রপ করে দিয়ে যাবে তো? কে আসছে, সেই শমিত?'

'দ্যাটস নান অফ ইয়োর বিজনেস। কাল কলেজে আয়।

'ইউ আর সিক বৈভবী। তুই আমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে বলেছিস, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ?'

'হোয়াই, হোয়াট অ্যাবাউট মি! আমি একজন পারফেক্টলি নর্মাল মেয়ে, আই নিড সেক্স। তোর মত আমার শরীরে, মনে একটা পুরুষমানুষ বন্দি হয়ে নেই। তোর উচিত একটা ছেলেকে ডেটিং করা।'

'বৈভবী, তুই মোটেই নর্মাল নোস রে। এই যে তোর অন্যের বয়ফ্রেন্ড কেড়ে নেওয়ার ঝোঁক, এটা কি নর্মাল মেয়ের স্বভাব? অন্য কারও কাছে তোর চেয়ে দামী সেলফোন দেখলে কিংবা কাউকে আরও দামী ড্রেস পরতে দেখলে তোর যে খুঁজে খুঁজে তাকে টেক্কা দেওয়া চাই, এটা কি নর্মাল মেয়ের স্বভাব? যতক্ষণ তা না পারছিস মনে মনে তুই যে

কিঙ্করের বাবা-মা গেছে ব্যাংকক। কিঙ্করের এখন পূর্ণ স্বরাজ। একলা রাজার মত থাকবে অন্তত দিনদশেক। বন্ধুবান্ধব ডেকে সারা রাত পার্টি। বৈভবী আর রুষাকে নিয়ে আকাশ ওর ফ্ল্যাটে পৌঁছল প্রায় রাত দশটা নাগাদ। তখন ঝমঝম মিউজিক চলছে। লিভিং রুমে ঠাসাঠাসি ভিড়। ঠেলেঠুলে তার মধ্যেই নাচ চলছে। অনেক নতুন নতুন মুখ। ভেতরের একটা বেডরুমে কী চলছে তা অবশ্য সকলে জানে না। সেখানে কয়েকজন উচ্চস্তরের বায়বীয় মার্গে বিচরণ করছে।

কেমন অস্থির হয়ে থাকিস তা কি আমি জানি না? সবসময় তোর হেরে যাওয়ার ভয়, তুই ভাবিস সকলে তোর প্রতিদ্বন্দ্বী। তুই ভেতরে ভেতরে ইনসিকিয়োর, তাই অ্যাগ্রেসিভ আর লোভী। এই নাকি নর্মাল মেয়ের লক্ষণ?'

বৈভবী সুইচ অফ করল।

আবার অন্য একদিন।

'তুই আছিস বৈভবী?'

'কেমন আছিস রুষা? কতদিন ক্লাসে আসিস না খেয়াল আছে?'

'আমার মা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন রে। হঠাৎই। জনডিস। '

'ওঃ রিয়েলি! আয়াম ভেরি সরি রুষা।'

'বাড়িতে ভাল লাগছে না, পরের সোমবার ক্লাসে যাব। তুই এখনও শমিতের সঙ্গে ঘুরিস?'

'মাঝেমাঝে। আমার নতুন বন্ধু হয়েছে। কস্তুরীর দাদা– আকাশ লাম্বা। ভেরি সুইট গাই। মোবাইক চালায় দারুন ফাস্ট। কাল রাতে ফ্লাইওভারে আমাকে নিয়ে হান্ড্রেড 'কে' স্পিড তুলেছিল, আই সোয়্যার। এলসো, হি কিসেস লাইক ব্র্যাড পিট–'

'আই হেট ব্র্যাড পিট। তুই নিজেকে বড্ড চিপ করে ফেলেছিস বৈভবী–'

'আকাশ আমার সঙ্গে লিভইন কর তে চায়। আমিও ভাবছি, এক্সপেরিমেন্ট করলে কেমন হয়...'

'ও, তাহলে তুই আমাকে চিরকালের মত বনবাসে পাঠাবি?'

'তুই আসবি এখানে রুষা? দারুন হবে। একটা ঘর স্পেয়ার আছে তো।'

'বৈভবী, তোর মন নেই বৈভবী? আমার সামনে তুই একটা লাফাংগা ছেলের সঙ্গে বিছানা শেয়ার করবি!'

'কেন রে, হিংসে হচ্ছে?'

'তুই একটা কী রে! আমার মা'র মৃত্যুর খবরটা শুনে তোর কিছু বলার নেই, স্রেফ সরি। মা তোকে কত আদর করেছিল সেবার মনে নেই।'

'মনে আছে। সি ওয়াজ এ সুইট লেডি–'

'মা সুইট লেডি। আকাশ সুইট গাই। সত্যি তোর মন নেই বৈভবী, বড্ড শ্যালো তুই। আত্মকেন্দ্রিক, নিজেকে ছাড়া কিছু বুঝিস না...'

আকাশ ফোন করেছে।

'তুই সকালে সেল ফোন সুইচ অফ করে রেখেছিলি?

'ঘুমোচ্ছিলাম, অনেক রাতে ফিরেছি–'

'ও, শমিতের বার্থডে ব্যাশ। তুই কেন যে এখনও–'

'দ্যাটস মাই বিজনেস। বল, কেন ফোন করেছিস আকাশ?'

'এমনিই। উই আর সাপোজড টু বি ইন লাভ, ভুলে গেছিস বৈভবী?'

'সাপোজড টু বি? আমি কিন্তু সত্যি তোকে ভালবাসি।'

'যে জন্যে ফোন করেছি শোন। উদয়াচল মার্কেটে আমি যে শো-রুমটা নিয়েছি তার ইন্টিরিয়ার ডেকরেশন প্রায় শেষ। ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম, তুই জানিস। তোর সঙ্গেও কতদিন দেখা করতে পারি না। এবার মোটামুটি আগে তাকাতে পারছি। এপ্রিলে বৈশাখীতে ওপেনিং হবে। তোকে ছেড়ে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে রে বৈভবী। আমাদের লিভইন করার প্ল্যান ছিল, মে-তে তোর কাছে শিফট করব, ও-কে?'

'কিন্তু শর্তটা মনে আছে তো? ঠিক এক বছর। তারপর ভাল লাগলে চালিয়ে যাব নইলে উই পার্ট। তুই রাজি?'

'রাজি। তা তোর রুমমেট রুষা তো আবার ফিরে এসেছে। ও কিছু মনে করবে না?'

'রুষা গেস্টরুমে থাকছে। ও আমাকে লেখাপড়ায় খুব হেল্প করে, নইলে আমার পাস করা হত না রে। নেক্সট ডিসেম্বরে আমাদের টেস্ট।'

'বৈভবী, ওকে বলিস ঠোঁটের ওপরে আর দাড়ি ওয়াক্সিং করতে। সি ইজ হাফ ম্যান, আই হিয়ার–'

'যাঃ সি ইজ ভেরি সুইট।'

বৈভবী তারপর চটপট কলেজে বেরবার জন্য তৈরি হয়ে নিল। গুজরাতি কাজ করা ঝোলা টপ। বাটিকের র‍্যাপ অন, কানে অক্সিডাইজড দুল। রুষা বলল, 'আকাশ ফোন করেছিল, না? ও কি এখনই তোর কাছে মুভ ইন করতে চায়?'

বৈভবী চোখের কোণে হালকা বাদামি পেনসিল বোলাতে বোলাতে রহস্যময়ী হাসল 'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?'

'সময় হলে জানতে পারবি। এখন থেকেই ওকে ভালবাসতে ভাল লাগছে...

কিঙ্করের বাবা-মা গেছে ব্যাংকক। কিঙ্করের এখন পূর্ণ স্বরাজ। একলা রাজার মত থাকবে অন্তত দিনদশেক। বন্ধুবান্ধব ডেকে সারা রাত পার্টি। বৈভবী আর রুষাকে নিয়ে আকাশ ওর ফ্ল্যাটে পৌঁছল প্রায় রাত দশটা নাগাদ। তখন ঝমঝম মিউজিক চলছে। লিভিং রুমে ঠাসাঠাসি ভিড়। ঠেলেঠুলে তার মধ্যেই নাচ চলছে। অনেক নতুন নতুন মুখ। ভেতরের একটা বেডরুমে কী চলছে তা অবশ্য সকলে জানে না। সেখানে কয়েকজন উচ্চস্তরের বায়বীয় মার্গে বিচরণ করছে। যৎসামান্য মারিউয়ানার নেশায় রুষা অভ্যস্ত। বাড়াবাড়ি কিছু নয়। সোজা কথায় গাঁজার অভ্যেস, সিগারেটে ভরে। একই বস্তু গ্রাস, পট, উইড, ডোপ ইত্যাদি নামেও চলে। বৈভবী একদম পছন্দ করে না যদিও, তাই রুষা গোপনে টানে।

আকাশ বৈভবীর সঙ্গে সহবাস করতে আসার পর থেকে সে রুষার প্রতি এক পরিশীলিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। অবশ্যই বৈভবীর নির্দেশে। রুষার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ঠাট্টাবিদ্রূপ ও সহ্য করে না। চেনা বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বৈভবী পার্টির ভিড়ে মিশে গেছে। রুষা একটা ডোপড সিগারেট জ্বালিয়ে আকাশকে দিল। দেখিয়ে দিল কীভাবে লম্বা টান মেরে দম বন্ধ করে রাখতে হয়। ফুসফুস ভরে ওঠে ধোঁয়ায়। সিগারেট আধাআধি শেষ হতেই আকাশের গলা শুকনো শুকনো ঠেকে। এবারই ওর হাতেখড়ি। বায়বীয় মার্গে প্রথম যাত্রা। যদিও আকাশ মনেমনে নার্ভাস, তবু রুষার কাছে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায় না। রুষা বলল, 'ভয় লাগছে নাকি? বৈভবী জানলে কেস খাওয়াবে, তাই!'

ভিড়ের মধ্যে বৈভবী হারিয়ে গেছে। পুরো সিগারেট শেষ হতে আকাশের মাথা বেশ হালকা লাগতে লাগল। শরীরটাই যেন হালকা হয়ে গেছে। বেশ লাগছে, ফুরফুরে নতুন রকমের অনুভূতি। হৃদস্পন্দন একটু যেন দ্রুত। ভয়ের ভাব কেটে গেছে অনেকক্ষণ। রুষা বলল, 'তুমি আজ জাতে উঠলে আকাশ। সিগমুন্ড ফ্রয়েড, অ্যাডলফ্ হিটলার, মেরিলিন মনরো সকলেই উচ্চমার্গের পথিক ছিল। জিমি হেনড্রিক্স তো সাতাশ

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে বৈভবী ওর লম্বা চুল আঁচড়াচ্ছে। রুষা ওর পেছনে এসে দাঁড়াল, বৈভবীর কাঁধে আলতো মাসাজ করতে করতে বলল, 'গসিপ শুনছি আকাশ নাকি মালবিকার সঙ্গে প্রেম করছে। তুই নিশ্চয় শুনেছিস সে মেয়েটা ড্রাগ অ্যাডিক্ট, তার ওপর এইচআইভি পজিটিভ। ওর জাহাজি বয়ফ্রেন্ড ওকে ইনফেক্ট করেছে। বেটার বি কেয়ারফুল বৈভবী। আকাশের লক্ষণগুলো বিপজ্জনক– এইডস নয় তো?'

বছর বয়সে মরেই গেল। লোকে বলে, সে এলভিস প্রিজলের চেয়েও বড় প্রতিভা ছিল।'

'হিটলার নেশা করত?

'তার ডাক্তার নিজেই হিটলারকে ড্রাগ সাপাই করত আকাশ। মিথাইল অ্যামফিটামিন। শিরার ভেতর ইনজেকশন– ইন্ট্রাভেনাস। নেশার গুরু। তা ছাড়া কোকোন টেস্টোভিরন ব্যবহার তো ছিলই–'

'আর ফ্রয়েড?'

'কোকেন। সকলকে জ্ঞান দিতেন, কোকেন নিলে যৌন অক্ষমতা দূর হয়। এসো আমার সঙ্গে আকাশ, তোমাকে নতুন দিগন্ত দেখাই...'

আকাশকে হাত ধরে রুষা নিয়ে গেল ভেতরের গোপন ঘরটায়। দশ বারোজন ছেলেমেয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে শুয়েব সে রয়েছে। ঘর ধোঁয়াময়। ডিম লাইট জ্বলছে। কেউ হেরোইন ফুঁকছে, কারও চোখে কাচের মত প্রাণহীন দৃষ্টি। মালবিকা দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে কার্পেটে বসে আছে। নাক বেয়ে মোটা সর্দি ঝরছে, ও টের পাচ্ছে না। ওর পাশে আকাশকে বসিয়ে দিয়ে রুষা বলল, 'বৈভবী জানতে পারবে না, ভয় নেই। জাস্ট রিল্যাক্স...'

একসময় রুষা হলঘরটায় ফিরে এসে মিশে গেল ডান্সফ্লোরের ভিড়ে। রাত অনেক। পার্টি ভাঙছে ধীরে ধীরে। বৈভবী ব্যস্ত হয়ে রন্নষার কাছে এসে বলল, 'তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ? আকাশকে দেখেছিস?'

'না, আমি তো তোকেই খুঁজছি।

'শমিত আমাকে টেনে নাচতে নিয়ে গেল, কী জানি আকাশ রাগ করল কিনা! ও যেরকম জেলাস... আবার ফোন সুইচ অফ করে রেখেছে...'

'একবার যেন আকাশকে দেখেছিলাম মালবিকাকে হাগ করছে, দু'জনে একই বিয়ার ক্যান থেকে চুমুক দিচ্ছিল, কে জানে, মালবিকার সঙ্গে ভিড়ে গেল কিনা!

বৈভবী অস্থির গলায় বলল, 'চল আমরা চলে যাই ট্যাক্সি ধরে নেব।'

আকাশ ফেরেনি সে রাতে।

আজকাল আকাশের হাত সর্বদা থরথর কাঁপে। দেহম নে অবসাদ। চোখদু'টো লালচে, মুখ সবসময় যেন জ্বরের ঘোরে ভারী। সে নিয়মিত রুষার থেকে গোপনে ড্রাগের জোগান পেয়ে যায়। বৈভবী বাস করে তার নিজস্ব দুনিয়ায়, আকাশের পরিবর্তন ওর নজরে পড়েছে কিনা বোঝা যায় না।

আকাশ একদিন চুপিচুপি বলল, 'রুষা, ম্যায় অ্যাডলফ্ হিটলার বননা চাহতা হুঁ। তুই মদত কর।'

'হিটলার হবি! পৃথিবীতে দ্বিতীয় কারও এমন অ্যামবিশান আছে বলে শুনিনি–'

'কোকেন, মুঝে কোকেন চাহিয়ে রুষা। গ্রাস ইজ ফর কাউজ।'

'অনেক খরচা, গ্রাসের মত সস্তার নেশা নয় রে যে, কুড়িপঁচিশ টাকায় এক পুরিয়া পাওয়া যাবে। কোকেনের বাজারদর এখন গ্রাম প্রতি অ্যাট লিস্ট পাঁচ হাজার টাকা, সিরিঞ্জ ফুটিয়ে ভেইনে পুশ করতে হয়। তুই আজকাল শো রন্নমে বসাও তো ছেড়েছিস–'

'সো হোয়াট? হিটলার হতে গেলে তো ইনভেস্ট করতেই হবে! আমাকে তুই পাতি বংগ্ পেয়েছিস?'

'বৈভবী জানতে পারলে আমাকে মেরে ফেলবে আকাশ।'

'বাওয়াল বকিস না রুষা, ওর সঙ্গে আমার লাইফটাইম কন্ট্রাক্ট নেই। আমায় হিটলার বানা। তোকে নিয়ে আমি অন্য ফ্ল্যাটে চলে যাব।'

'কোকেনের সোর্স আমি জানি। একটা প্রমিস করতে হবে আকাশ– ইউ উইল নেভার স্পি উইথ বৈভবী এগেন। প্রমিস?'

আকাশ একটু যেন বিষণ্ন, বলল, 'জানিস, সামথিং ইজ রং উইথ মি। কয়েক মাস যাবৎ আই কান্ট গেট ইট আপ এনি মোর...'

মালবিকার মাধ্যমে নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিল রন্নষা। মালবিকার ব্যবহার করা সিরিঞ্জও হাতিয়েছিল একটা।

রুষা একদিন বলল বৈভবীকে, 'তুই আকাশের মধ্যে কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিস?'

নতুন কেনা ডিজাইনার ইভনিং ড্রেস পরে বৈভবী আয়নার সামনে নিজেকে ঘুরিয়েফিরি য়ে দেখছিল। বলল, 'রোজই ভাবি তোকে বলব রুষা, তারপর ভুলে যাই। পরিবর্তন কী রে, ড্রাসটিক চেঞ্জ, মাঝেমাঝে মনে হয় আগে যে আকাশকে চিনতাম এ ছেলেটা সে নয়। এ যেন অন্য কেউ, একটা রুইন... ধ্বংসস্তূপ। ওর মেজাজ কেমন হিংস্র হয়ে গেছে, কথায় কথায় রেগেমেগে জিনিসপত্র ছোঁড়ে। আর চেহারাটা দেখেছিস? বুড়োটে, রোগা কাঠি, শরীর কাঁপে। চোখে নাকি ভুলভাল দেখে। কাজে বেরনো কবেই ছেড়ে দিয়েছে। তুই ওকে গোড়া থেকে দেখছিস রুষা, কী রকম প্রাণচঞ্চল ছেলে ছিল আকাশ– এরকম ভাঙাচোরা ছিল না কখনও। এখন ঘনঘন হাঁচি দিচ্ছে, কাশছে। নাক থেকে বিড করে। হাজারবার বলেছি, ডাক্তার দেখাতে, পাত্তা দেয় না–'

'আর কিছু? আর ইউ হ্যাপি ইন বেড?'

'আকাশ একদম বদলে গেছে রুষা। মে বি হি ইজ ফলিং আউট অফ লাভ। আমাকে বোধহয় আর ভালবাসে না। কতদিন সেক্স হয়নি ভুলে গেছি। আমাদের কী হবে রে?'

'ও কি অন্য কোনও মেয়ের কাছে পাচ্ছে?'

'সেরকম হলে, আকাশ যেমন ছেলে, চলে যেত এখান থেকে। কী করব রে?'

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে বৈভবী ওর লম্বা চুল আঁচড়াচ্ছে। রুষা ওর পেছনে এসে দাঁড়াল, বৈভবীর কাঁধে আলতো মাসাজ করতে করতে বলল, 'গসিপ শুনছি আকাশ নাকি মালবিকার সঙ্গে প্রেম করছে। তুই নিশ্চয় শুনেছিস সে মেয়েটা ড্রাগ অ্যাডিক্ট, তার ওপর এইচআইভি পজিটিভ। ওর জাহাজি বয়ফ্রেন্ড ওকে ইনফেক্ট করেছে। বেটার বি কেয়ারফুল বৈভবী। আকাশের লক্ষণগুলো বিপজ্জনক– এইডস নয় তো?'

বৈভবী তার প্রতিবিম্বের চোখের দিকে বোধহয় সিদ্ধান্তের আশায় তাকিয়ে আছে। অসহায় দৃষ্টি। রুষা ধীরে ধীরে ওর কাঁধ মাসাজ করতে লাগল...

শ্যামল দত্তচৌধুরী
ভারতের ছোটগল্পকার

শেষপাতা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালি কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে বর্তমান ঝাড়খ- রাজ্যের দুমকা শহরে। জন্মপত্রিকায় তাঁর নাম রাখা হয়েছিল অধরচন্দ্র। পিতা রেখেছিলেন প্রবোধকুমার আর ডাকনাম মানিক। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা নীরদাসুন্দরী দেবীর ১৪ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন অষ্টম। তার পিতা ছিলেন তৎকালীন ঢাকা জেলার সেটেলমেন্ট বিভাগের সাব্ রেজিস্টার। পিতার বদলির চাকরিসূত্রে মানিকের শৈশব্ কৈশোর ও ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় বাংলাবিহাব্উড়িষার দুমকা, আরা, সাসারাম, কলকাতা, বারাসাত, বাঁকুড়া, তমলুক, কাঁথি, মহিষাদল, গুইগাদা, শালবনী, নন্দীগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, টাঙ্গাইল প্রভৃতি শহরে। তাঁর মাতা নীরদাসুন্দরীর আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের গাঁওদিয়া গ্রামে। এই গ্রামটির পটভূমিকায় তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *পুতুল নাচের ইতিকথা*। পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের কারণে ঐ অঞ্চলের মানুষের জীবনচিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মেছিল মানিকের। তাই ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনচিত্রকে তিনি তাঁর সাহিত্যে অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। বিচিত্র সব মানুষ সম্পর্কে তাঁর ছিল বিপুল অভিজ্ঞতা– সেই অভিজ্ঞতার আলোকে পদ্মার তীরবর্তী জেলেপাড়ার পটভূমিতে রচনা করেন *পদ্মা নদীর মাঝি* উপন্যাস।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী জুড়ে মানবিক মূল্যবোধের চরম সঙ্কটের মুহূর্তে বাংলা কথাসাহিত্যে যে ক'জন লেখকের হাতে বৈপ্লবিক ধারা সূচিত হয়েছিল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তার অন্যতম। তাঁর রচনার মূল বিষয়বস্তু মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, নিয়তিবাদ ইত্যাদি। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ ও মার্কসীয় তত্ত্বে গভীরভাবে প্রভাবিত এই লেখকের আভ্যন্তরিক রিয়ালিজম্ ঘেঁষা মনোভাব তাঁকে শিল্পজীবনের আদর্শ থেকে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে বিচ্যুত করেছিল। এমনকি, মধ্য ও শেষ দিকের লেখার তিনি সচেতনভাবেই অসুন্দরের পূজারী হয়ে উঠেছিলেন বললেও অত্যুক্তি হবে না। ক্ষুদ্রপরিসর জীবনে তিনি রচনা করেন বিয়াল্লিশটি উপন্যাস ও দু'শো ছোটগল্প। তাঁর রচিত *পুতুল নাচের ইতিকথা, দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি* প্রভৃতি উপন্যাস, *অতসীমামী, প্রাগৈতিহাসিক, ছোট বকুলপুরের যাত্রী* ইত্যাদি গল্প সংকলন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে বিবেচিত।

১৯২৬ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং ১৯২৮ সালে বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন থেকে আই এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিত বিষয়ে সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হন। কলেজ ক্যান্টিনে একদিন আড্ডা দেওয়ার সময় এক বন্ধুর সঙ্গে বাজি ধরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অতসীমামী নামে একটি গল্প লিখে *বিচিত্রা* পত্রিকায় পাঠান। সেসময় কলকাতায় *বিচিত্রা* ছিল অত্যন্ত বিখ্যাত এবং নামকরা লেখকরাই তাতে লিখতেন। *বিচিত্রা* সম্পাদকের দপ্তরে পাঠানো গল্পের শেষে নাম স্বাক্ষর করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্প পাঠানোর চারমাস পরে *বিচিত্রায়* ছাপা হয় তাঁর লেখা। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই গল্পটি পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি পরিচিত হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে। এরপর তিনি বিভিন্ন পত্রপ ত্রিকায় লেখা পাঠাতে শুরু করেন।

সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশের ফলে তাঁর একাডেমিক পড়াশোনায় ব্যাপক ক্ষতি হয়; শেষাবধি শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটে। সাহিত্যরচনাকেই তিনি তাঁর মূল পেশা হিসেবে বেছে নেন। এরপর কিছুদিন *নবারুণ* পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে এবং পরবর্তীকালে *বঙ্গশ্রী* পত্রিকায় সহ্লস ম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৩৮ সালে সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা কমলা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ১৯৩৯ সালে তিনি একটি প্রেস ও প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৩ সালে মানিক কয়েক মাস একটি সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এ সময় তাঁর লেখায় কমিউনিজমের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৬ সালে ভারতে দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন এবং ১৯৫৩ সালে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

১৯৩৫ সাল থেকে তিনি মৃগি রোগে আক্রান্ত হন যা পরবর্তীকালে জটিল আকার ধারণ করে। অবশেষে দীর্ঘদিন রোগভোগের পর মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে ১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শক্তিশালী এই কথাসাহিত্যিকের জীবনাবসান ঘটে।

● নিজস্ব প্রতিবেদক

১৮ এপ্রিল ২০১৪ সন্ধ্যায় গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ভারতের শ্রেয়া গুহঠাকুরতার রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে সামিউল ইসলাম পোলাকের আবৃত্তি পরিবেশন ॥ ১৯ এপ্রিল ২০১৪ একই সময়ে একই মিলনায়তনে শেখ জসিমউদ্দিন কবিরের গজল পরিবেশন

২৫ এপ্রিল ২০১৪ সন্ধ্যায় গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আবদুল ওয়াদুদের রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন ॥ ২৬ এপ্রিল ২০১৪ একই সময় একই মিলনায়তনে বিশ্বজিৎ রায়ের সঙ্গীত পরিবেশন

উপরে: বাম থেকে ডানে ॥
২৪২৬ মার্চ ২০১৪ সন্ধ্যায় বাংলাদেশের ৪৪তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত কবিতাসন্ধ্যায় সৈয়দ শামসুল হক ড. দিলারা হাফিজ, মো. নূরুল হুদা, হাবিবুলাহ সিরাজী, আনোয়ারা সৈয়দ হক, রফিক আজাদ ও নির্মলেন্দু গুণএর কবিতা পরিবেশন

নীচে: বাম থেকে ডানে ॥
২৪২৬ মার্চ ২০১৪ সন্ধ্যায় বাংলাদেশের ৪৪তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠানে তপন মাহমুদ, শাহীন সামাদ ও তিমির নন্দীর সঙ্গীত পরিবেশন

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra May 2014

সত্যমেব জয়তে

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা এবং সহকারী হাই কমিশন, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর ভিসা সেবা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-কে আউটসোর্স করা হয়েছে। এসবিআই বাংলাদেশে ছয়টি ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি) পরিচালনা করে থাকে। এগুলি হচ্ছে: ১. আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা, ২. আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা, ৩. আইভিএসি, চট্টগ্রাম, ৪. আইভিএসি, সিলেট , ৫. আইভিএসি, খুলনা এবং ৬. আইভিএসি, রাজশাহী।

আইভিএসি-তে সকল কর্মদিবসে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। ভিসা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবার পর পাসপোর্ট বিকাল ৩টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে ফেরত দেওয়া হয়। আবেদন প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদির পূর্ণ বিবরণ **www.ivacbd.com** এবং **www.hcidhaka.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে ।

হেল্পলাইনসমূহ: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকায় আপৎকালীন প্রয়োজন মেটানোর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এখানে চিকিৎসা ও অন্যান্য জরুরি পারিবারিক প্রয়োজন সংক্রান্ত ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্যে একটি কাউন্টার রয়েছে।

আইভিএসি, গুলশান-এর হেল্পলাইন ডেস্ক: ই-মেইল: info@ivacbd.com, এবং visahelp@ivacbd.com; ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৯৮৬৩২২৯; টেলিফোন: +৮৮০২ ৮৮৩৩৬৩২, +৮৮০২ ৯৮৯৩০০৬ (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা)

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার ভিসা হেল্পলাইন ডেস্ক: ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in; টেলিফোন: +৮৮০২ ৯৮৮৮৭৯২ (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা)

জনসাধারণের জন্য জ্ঞাতব্য:

- ভারতীয় ভিসা পেতে বাংলাদেশের নাগরিকদের কোনও ভিসা ফি দিতে হয় না। আইভিএসি প্রক্রিয়া ফি বাবদ আবেদনপত্র পিছু যে চারশত টাকা নেয়, তা ফেরতযোগ্য নয়।
- ভিসা আবেদনপত্রে প্রদত্ত সকল তথ্যের নির্ভুলতার ব্যাপারে আবেদনকারী দায়ী থাকবেন।
- আবেদনপত্রে যে কোন ভুলের জন্য আবেদনপত্র অগ্রহণযোগ্য হতে পারে।
- আবেদনপত্রের সঙ্গে সদ্যতোলা ছবি (৩ মাসের বেশি পুরনো নয়) সংযোজন করতে হবে।
- আবেদনকারী ভারতভ্রমণে কোন্ শ্রেণীর ভিসা চান তার উলেখ করতে হবে–
  ১. মনে রাখতে হবে যে, একান্ত জরুরি না হলে ট্যুরিস্ট ভিসায় ভারতে গিয়ে চিকিৎসা করানোর অনুমতি নেই।
  ২. নিয়মিত ও পূর্ব-নির্ধারিত চিকিৎসা সেবার জন্য কেবল মেডিক্যাল ভিসার জন্যই আবেদন করতে হবে।
  ৩. রোগীর সঙ্গে মাত্র ৩ জন মেডিক্যাল এটেনডেন্ট যেতে পারবেন এবং তাঁদের একত্রে ভিসার আবেদন করতে হবে।
  ৪. ব্যবসায়ের জন্য ভারতে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বিজনেস ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে।
- ভুল তথ্য-উপাত্ত সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রদানের জন্য আবেদনকারীরাই দায়ী থাকবেন।
- আবেদনপত্র জমা নেওয়ার সঙ্গে ভিসাপ্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা নেই। যে কোনও সময় কোন কারণ ছাড়াই ভিসা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে।

উপরোক্ত নিয়মাবলী পালন করলে ভিসাপ্রাপ্তি সহজ হবে।

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত